

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ  
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণী

রচনা

ড. পরেশ চন্দ্র মন্ডল  
ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য  
নিরঞ্জন অধিকারী

সম্পাদনা

ড. মাধবী রানী চন্দ

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা  
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯৬

সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ

ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ :

সেলিম আহমেদ

চিত্রাঙ্কন

আনওয়ার ফারুক

বীরেন সোম

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

“সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।”

---

মুদ্রণ :

## প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য “শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স” গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সমন্বয়যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের বিভিন্ন সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শ্রেণীভিত্তিক যে শিখনফলসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা যেন সেগুলো সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য শিখনফলভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।

ধর্মশিক্ষা সভ্যতার প্রধান বাহন এবং মানবতার মূল চাবিকাঠি। কারণ ধর্ম ও শিক্ষা অজাঙ্জিতাবে জড়িত বা একে অপরের পরিপূরক। বেদ ও উপনিষদের শ্লোক ও স্তোত্র সমৃদ্ধ উপদেশমূলক এই বইটিতে মহামানবদের আত্মত্যাগে দীপ্ত এমন সব জীবনীগাথা তুলে ধরা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় অনুভূতিসহ সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেমের মহান স্রোতধারায় স্নাত হয়। আশা করা যায়, এই মূল্যবোধসমূহ তাদের ভেতরের সুপ্ত সুকুমার বৃত্তির জাগরণ ঘটাবে এবং প্রত্যেককে সং নিষ্ঠাবান ও আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তুলবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণীর ৬০টি পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে সময়মতো পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্ছৃতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

## সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	স্রষ্টা ও সৃষ্টি .....	১
দ্বিতীয়	স্তব-স্তোত্র-প্রার্থনা .....	৪
তৃতীয়	ধর্ম-দর্শন .....	৮
চতুর্থ	ধর্মগ্রন্থ .....	১৩
পঞ্চম	দেব-দেবী .....	১৮
ষষ্ঠ	পূজা-পার্বণ .....	২২
সপ্তম	নীতিজ্ঞান .....	২৯
অষ্টম	ধর্মাধর্ম .....	৩৫
নবম	উপাখ্যান .....	৩৮
দশম	আদর্শ জীবনচরিত .....	৪৬

## প্রথম অধ্যায় স্রষ্টা ও সৃষ্টি

সুনীল আকাশে দিনের বেলায় সূর্যের আলো ঝলমল করে ওঠে। আবার কোথা থেকে কালো মেঘে ঢেকে যায় সারাটা আকাশ। ঢাকা পড়ে যায় সূর্যের আলো। রাতের বেলা নীল আকাশ কেমন কালো হয়ে যায়। কালো আকাশে তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলে। কখনও বা চাঁদ ওঠে। কি মিষ্টি চাঁদের আলো।



প্রাকৃতিক দৃশ্য

এই সূর্য, এই চাঁদ, এই আকাশ ছাড়াও আমাদের প্রাকৃতিক জগতে আরও অনেক সুন্দর ও বিচিত্র জিনিস রয়েছে। রয়েছে আকাশের মত নীল এবং ঢেউয়ের মুকুট-পরা সমুদ্র। কোথাও রয়েছে সুউচ্চ ও বিশাল পর্বতমালা। কোথাও শ্যামল সবুজ বৃক্ষরাজি। ফুলে বা ফলে ছাওয়া লতা। সেই বৃক্ষের শাখায় কিংবা লতার আড়ালে কত রং বেরঙের পাখি। আবার বনের মধ্যে বাঘ ভালুকের মত হিংস্র আর হরিণের মত নিরীহ পশু। সবুজ ধানের খেত আর শ্যামল বনের বুক চিরে বয়ে যায় হাজার নদীর ধারা। কোথাও বা ধুধু করে মন্থভূমি। সব মিলিয়ে আমাদের প্রাকৃতিক জগৎ বড় বিচিত্র, বড় সুন্দর। প্রাকৃতিক এ সকল কিছু হঠাৎ করে কিছু পৃথিবীতে আসেনি। এসব আপনা আগনিও হয়নি। এর পেছনে একজন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। এই সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ঈশ্বর বলি। তাঁকে ব্রহ্মও বলা হয়। ভগবানও তাঁর আর একটি নাম। সকল সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টা রয়েছেন। স্রষ্টার সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বলেই সৃষ্টি এত সুন্দর। তাই সৃষ্টিকে ভালোবাসলে স্রষ্টাকেই ভালোবাসা হয়। জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। তাই তো আমরা বিবেকানন্দ বলেছেন :

‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর’।

ঈশ্বরই জীবের রূপ ধরে পৃথিবীতে রয়েছেন। আমরা তা বুঝতে পারি না বলে বা জানি না বলে জীবকে ঈশ্বর ভেবে ভালোবাসি না, সেবা করি না, বরং কখনও কখনও অবহেলা করি, উপেক্ষা করি। হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করার উপদেশ রয়েছে। ঈশ্বরজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে।

ঈশ্বর কীভাবে জীবের মধ্যে রয়েছেন? ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে রয়েছেন। আর সেই কারণেই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এ কথার মধ্যে হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে। তা হচ্ছে ঈশ্বরতত্ত্ব।

হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদে বলা হয়েছে, পরমপুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে পৃথিবীর চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করছেন। উপনিষদও ধর্মগ্রন্থ। উপনিষদে বলা হয়েছে যে ঈশ্বরকে সূর্য প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্র বা তারকারাও নয়। তিনি নিজের আলোতে নিজে প্রকাশিত হন এবং একই সাথে অন্যদের প্রকাশ করেন। তিনিই নীল পতঙ্গ, তিনিই সবুজ রঙের টুকটুকে লাল ঠোঁটের টিয়া পাখি, তিনিই মেঘ, যার ভেতর থেকে বিদ্যুৎ চমকায়। তাঁর থেকেই নিখিল ভুবনের সৃষ্টি। গীতায় বলা হয়েছে, তিনি আদিপুরুষ, অনন্ত তাঁর রূপ। তিনি পরমাত্মা এবং পরম আশ্রয়। পরমাত্মার অংশ বলেই জীবের ভেতর যে আত্মা আছে তার ধ্বংস নেই। ধ্বংস হয় দেহের। মানুষ যেমন পুরনো কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় পরে, তেমনি আত্মা পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। এভাবে আত্মার দেহ পাল্টানোর ব্যাপারটাই জন্ম আর মৃত্যু। হিন্দুধর্মে একেই বলে জন্মান্তরবাদ। বারবার জন্ম হতে হতে এমন একসময় আসে যখন আর জন্ম হয় না। তখন জীব মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে।

হিন্দুধর্ম একই সাথে জীব ও জগতের মঙ্গল এবং জীবের মুক্তি চায়। জীবের মঙ্গল চায় বলে ঈশ্বরের নানা প্রকার শক্তির কাছে নানা প্রকার প্রার্থনা জানায়। ঈশ্বরের এ সকল শক্তিকে বলে দেবতা। যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু আমাদের পালন করেন, সরস্বতী বিদ্যার দেবী ইত্যাদি। একজন হিন্দুর কাছে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নিরাকার, কিন্তু তিনি সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর সাকার রূপকে বিভিন্ন দেবতারূপে পূজা করা হয়। এভাবে হিন্দুধর্মে দুই প্রকার উপাসনার রীতি দাঁড়িয়ে গেছে (১) নিরাকার পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা এবং (২) সাকার দেব দেবতার পূজা বা সাকার উপাসনা।

আবার দুষ্টির দমন, শিষ্টির পালন এবং ধর্মরক্ষার জন্য ঈশ্বর নানারূপ ধরে পৃথিবীতে অবতরণ করেন বা নেমে আসেন। অবতরণ করেন বলে তাঁকে অবতার বলে। যেমন বামন, নৃসিংহ, রাম প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার। অবতারের কাজও জীব ও জগতের কল্যাণসাধন।

হিন্দুধর্ম সনাতন। সনাতন মানে চিরন্তন-যা ছিল, যা আছে এবং যা ভবিষ্যতেও থাকবে। এই সনাতন ধর্মকেই প্রচলিত কথায় হিন্দুধর্ম বলে। ঈশ্বরতত্ত্ব, পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সাথে জীবাত্মার সম্পর্ক, ঈশ্বর-জ্ঞানে জীবকে ভালোবাসা, অবতার, ঈশ্বর লাভের চেষ্টা বা সাধনা, জন্মান্তরে বিশ্বাস, মোক্ষ প্রভৃতি হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়। তাঁর গুণকীর্তন করতে হয়। দেবতাদের পূজা করা হয়। পূজা করে তাঁদের কাছে ভক্তেরা চায় সুখ, চায় শান্তি। পূজার জন্য মন্দির তৈরি করা হয়। ধর্মীয় পবিত্র স্থানকে বলা হয় তীর্থ। তীর্থে গেলে দেহমন পবিত্র হয়। হিন্দুধর্মের মূল কথাই হল ঈশ্বরে ভক্তি, জগতের কল্যাণ এবং আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা। এই সাধনা আবার ঈশ্বরমুখী। এই ঈশ্বর থেকেই জীবের সৃষ্টি। আবার জীবের মধ্যেও ঈশ্বর রয়েছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথাটি সুন্দর করে বলেছেন :

‘সীমার মাঝে অসীম তুমি

বাজাও আপন সুর

আমার মাঝে তোমার প্রকাশ

তাই এত মধুর।’

সীমা অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে অসীম অর্থাৎ পরম স্রষ্টার বা ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে বলেই সৃষ্টি এত সুন্দর, এত মধুর।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. হিন্দুদের আদি ধর্ম গ্রন্থের নাম কী?  
 ক. বেদ  
 গ. পুরাণ  
 খ. মহাভারত  
 ঘ. মনুসংহিতা
২. “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,” স্বামী বিবেকানন্দ কাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছেন?  
 ক. ব্রাহ্মণ  
 গ. মা-বাবা  
 খ. বড়ভাই  
 ঘ. মানুষ
৩. জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ কারণ, উভয়েরই—  
 i. একই গুণ বিদ্যমান  
 ii. ক্ষয় আছে  
 iii. বিনাশ নাই
- নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i  
 গ. iii  
 খ. ii  
 ঘ. i ও iii
৪. উপনিষদ মতে, ঈশ্বরকে সূর্য দেবতা প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, তিনি প্রকাশিত হন—  
 ক. নিজে নিজে  
 গ. অগ্নির দ্বারা  
 খ. চন্দের দ্বারা  
 ঘ. আলোর মাধ্যমে

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. আমাদের এই বিচিত্র পৃথিবীতে ঈশ্বর জীবের মধ্যে রয়েছেন। আমরা তা বুঝতে পারি না বলে জীবকে ভালোবাসি না বরং অনেক সময় অবহেলা করি। তাছাড়া জীবকে কীভাবে সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয় তা আমরা জানি না। হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করার উপদেশ রয়েছে। কারণ ব্রহ্মই পরমাত্মা এবং জীবের মধ্যে রয়েছে আত্মা।  
 ক. ঈশ্বর কে?  
 খ. হিন্দুধর্মে জীবসেবা করার কথা বলা হয়েছে কেন?  
 গ. তোমার দরিদ্র সহপাঠী, বই ও বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পোশাকের অভাবে বিদ্যালয়ে আসতে পারছে না, সেক্ষেত্রে তুমি তাকে কীভাবে সাহায্য করবে?  
 ঘ. ‘জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ’—বুঝিয়ে লেখ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় স্তব-স্তোত্র প্রার্থনা

(ক) স্তব-স্তোত্র

১। বেদ

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ

সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃতা

অত্যতিষ্ঠদ্ দশাজুলম্ ॥ (ঋগ্বেদ (১০/৯০/১))

সরলার্থ

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পা। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে পৃথিবী অপেক্ষা দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।

২। উপনিষদ

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপচ্চিন্

নায়ৎ কুতচ্চিন্ বভূব কচ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(কঠোপনিষদ ১।২।১৮)

সরলার্থ

পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোনো কারণ থেকে ঐর উৎপত্তি হয়নি, পরমাত্মা থেকে (প্রত্যক্ষভাবে) কোনো কিছু জন্মগ্রহণ করেনি। এই পরমাত্মা অজ, নিত্য, শাস্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হলেও ঐর বিনাশ নেই।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো

লোকত্রয়েহ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ (১১/৪৩)

সরলার্থ

হে অমিতপ্রভাব পুরুষ, তুমি স্থাবর ও জঙ্গম জগতের পিতা, তুমি পূজনীয় ও শ্রেষ্ঠ গুরু। এই ত্রিভুবনে তোমার সমান প্রভাবসম্পন্ন কেউ নেই। তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোথায় বা কীভাবে থাকবে?

৪। শ্রী শ্রী চণ্ডী

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সধস্থিতে।

স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥



## সরলার্থ

হে নারায়ণি, তুমি বুদ্ধিরূপে আমাদের সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছ, তুমি আমাদের স্বর্গদাতা ও মুক্তিদাতা। তোমাকে নমস্কার।

## (খ) প্রার্থনা

শ্রীমদভগবদ্গীতা

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত—

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ (১১/৪৬)

## সরলার্থ

মুকুট, গদা এবং চক্রধারী তোমার পূর্বের রূপটি আমি দেখতে চাই। হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বরূপ, তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

## ২। বাংলা প্রার্থনা

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার

চরণধুলার তলে।

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান

নিজেরে কেবলই করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া

ঘুরে মরি পলে পলে।

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।

আমারে না যেন করি প্রচার

আমার আপন কাজে;

তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ

আমার জীবন মাঝে।

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,

পরানে তোমার পরম কান্তি,

আমারে আড়াল হৃদয়পদ্মদলে করিয়া দাঁড়াও।

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## টীকা

বেদ—বেদ হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ। এর অর্থ জ্ঞান। ঋষিগণ ধ্যানযোগে বেদমন্ত্রসমূহ দর্শন করেন। তাই এঁদের বলা হয় বেদের দ্রষ্টা। বেদ চারটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব।

উপনিষদ—বেদের দুটি কাণ্ড—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। এতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা আছে। প্রধান উপনিষদ বার খানা। এগুলোর মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি অন্যতম।

## শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুদের একটি মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থটি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলোর সমন্বয়েই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রচিত। গীতা নামেই এই গ্রন্থটি পরিচিত। গীতা সমস্ত উপনিষদের সারবস্তু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ঋগ্বেদ ১০/৯০/১ = ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নব্বই সংখ্যক সূক্তের প্রথম মন্ত্র। কঠোপনিষদ ১/২/১৮ = কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বহ্লীর অষ্টাদশ মন্ত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১/৪৩ ও ১১/৪৬ = শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৪৩তম ও ৪৬তম শ্লোক।

স্তোত্র—প্রশংসা বা গুণকীর্তন। প্রার্থনা—কোন কিছু চাওয়া।

কয়েকটি পদের সন্ধি বিশ্লেষণ ও অর্থ :

অত্যতিষ্ঠৎ – অতি + অতিষ্ঠৎ, অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন। নায়ম্-ন + অয়ম্, অয়ম্-এই। কুতচ্চিন্ন-কুতঃ + চিৎ + ন, কুতচ্চিৎ কিছু থেকে। শাস্বতোহয়ং-শাস্বতঃ + অয়ং।

অজ-যার জন্ম হয় না।

হন্যমানে-হত হলেও।

ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ- ত্বৎসমঃ + অস্তি + অতি + অধিকঃ।

কুতোহন্যো-কুতঃ + অন্যো

লোকত্রয়েহুপপ্রতিমপ্রভাব-লোকত্রয়ে + অপি+ অপ্রতিম প্রভাব।

চক্রহস্তমিচ্ছামি – চক্রহস্তম্ + ইচ্ছামি।

২ = লুপ্ত অ।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মোট অধ্যায় রয়েছে—

ক. পনেরটি

গ. সতেরটি

খ. ষোলটি

ঘ. আঠারটি

২. প্রার্থনায় কোনো কিছু—

ক. চাওয়া হয়

গ. পাওয়া হয়

খ. প্রশংসা করা হয়

ঘ. অনুধাবন করা হয়

৩. হিন্দুর ধারণা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের মাধ্যমে—

- i. ঈশ্বরকে কীভাবে সেবা করা যাবে তা জানা যায়
- ii. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে দেওয়া উপদেশ জানা যায়
- iii. দেবী দুর্গার মহিমা জানা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |           |
|--------|-----------|
| ক. i   | খ. ii     |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

৪. বুদ্ধিরূপে কে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. সরস্বতী | খ. দুর্গা |
| গ. শিব     | ঘ. গণেশ   |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গীতায় অর্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, “হে সহস্রবাহু, হে বিশ্বরূপ, তুমি সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।” শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ‘তুমি আমার প্রিয় তাই এইরূপ দর্শন করালাম’।

৫. গীতা মহাভারতের কোন পর্বের অন্তর্গত?

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| ক. ভীষ্ম পর্বের        | খ. অযোধ্যা পর্বের |
| গ. কিস্কিন্ধ্যা পর্বের | ঘ. লংকা পর্বের    |

৬. তুমিও কৃষ্ণের প্রিয় হলে কী করতে?

- i. অর্জুনের মতোই বলতাম
- ii. কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতাম
- iii. তাঁকে আলিঙ্গন করতাম

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |             |
|--------|-------------|
| ক. i   | খ. ii       |
| গ. iii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. ঐশী মায়ের পাশে বসে উপনিষদ (কঠোপনিষদ ১/২/১৮) পাঠ শুনছিল এবং মাকে বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। মা এর সরলার্থ বুঝিয়ে বলছিলেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্  
নায়ং কুতশ্চিন্ বভূব কশ্চিৎ।  
অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো  
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

ক. প্রধান উপনিষদ কত খানা?

খ. মা-ঐশীকে,

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥-এর সরলার্থে কী বলেছিলেন?

গ. উপরোক্ত শ্লোকের আলোকে ব্রহ্মের মহিমা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘পরমাত্মা অবিনাশী’-কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

## তৃতীয় অধ্যায়

### ধর্ম-দর্শন

ধর্ম ও দর্শন—এ দুটি শব্দ মিলে ধর্ম-দর্শন। যা থেকে মানুষের কল্যাণ হয় তাকে ধর্ম বলে। আর এই কল্যাণ লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা, পূজা-অর্চনা করতে হয়। কেননা ভগবান হলেন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

অপরদিকে দর্শন শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে চোখ দিয়ে দেখা। তবে বিশেষ অর্থে দর্শন মানে তত্ত্বদর্শন অর্থাৎ জগৎ ও জীবের স্বরূপ সম্পর্কে জানা। জগতের স্বরূপ কি? কে জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন? জগৎ ও জীবের সঙ্গে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা হল দর্শন।

ধর্ম ও দর্শনের প্রকৃতি ভিন্ন। ধর্মের মধ্যে রয়েছে অনুভূতি, কল্পনা, ভাবাবেগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

দার্শনিক ঈশ্বরকে জানতে চান বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে। নিছক কল্পনা, ভাবাবেগ তাঁর কাছে অর্থহীন। বিচার বিবেচনাহীন কোন বিশ্বাসেরও মূল্য নেই দার্শনিকের কাছে। মোট কথা ধর্মচেতনার উৎস মানুষের হৃদয়ের আবেগ, কিন্তু চিন্তার উৎস হল মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধি।

তবে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে মিলও রয়েছে। ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মোক্ষলাভ।

মোক্ষ মানে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের এক হয়ে যাওয়া। ভারতীয় দর্শনেরও মোক্ষলাভই হল পরম লক্ষ্য।

প্রতিটি ধর্মমতেরই দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। ভারতীয় দর্শনসমূহকে আস্তিক ও নাস্তিক—এ দুভাগে ভাগ করা যায়। বেদ-উপনিষদকে যে দর্শন প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে তাকে বলে আস্তিক দর্শন। আবার যেসব দর্শন বেদ-উপনিষদকে মানে না, সেগুলোকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শন ছয়টি, যথা—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত। ছয়টি আস্তিক দর্শনকে এককথায় ষড়্দর্শন বলা হয়। অপরদিকে বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শন—এই তিনটিকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন।

যে দর্শন ধর্মকে নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে তাকে বলা হয় ধর্ম-দর্শন। ধর্ম-দর্শনের বিষয়বস্তুও বিস্তৃত। মানুষের ধর্মচেতনা, ধর্মীয় ভাবাবেগ, ঈশ্বর, দেবদেবী, আত্মা, পরলোক, ধর্মীয় আচার, বিধি-নিষেধ, সামাজিক নিয়ম-প্রথা এসবই ধর্ম-দর্শনের বিষয়। মোটকথা কর্মের সাথে তত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয় করাই ধর্ম দর্শনের কাজ। এছাড়া ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অমরত্ব এ দুটি বিষয়ও ধর্ম-দর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্ম ও দর্শনের কাজ হচ্ছে কল্যাণ ও মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ। আবার ধর্মীয় বিধি-বিধানের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ করাই হল ধর্ম-দর্শনের উদ্দেশ্য।

# যোগাসন

ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে যোগ। সাধারণভাবে যোগ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত করা। তবে ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ঈশ্বরের যোগসাধন করা।

ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ এবং মন উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে ধর্ম সাধনা অগ্রসর হয়। তাই দেহকে সুস্থ রাখা সাধনার পূর্বশর্ত। স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় দেহ হচ্ছে রোগের আশ্রয়স্থল। অতি সহজেই দেহ রোগগ্রস্ত হয়। যুগে যুগে মন ভালো থাকে না। অসুস্থ দেহ-মন নিয়ে খেলাধুলা, পড়াশোনা, সাংসারিক বা ধর্মীয় কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। তাই শাস্ত্রীয় বচন হচ্ছে ‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্’ অর্থাৎ ধর্ম সাধনার প্রথম অবলম্বন হচ্ছে শরীর। আর এজন্য প্রাচীনকালে মুনিঋষিগণ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে যোগাসন অনুশীলনের বিধান দিয়ে গেছেন। যোগাসন হচ্ছে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার একটি প্রক্রিয়া।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রণেতা। যোগের আটটি অঙ্গ। যথা- (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি।

(১) যম-যম মানে সংযমী হওয়া।

(২) নিয়ম-শরীরে প্রতি যত্ন নেওয়া। নিয়মিত ও পরিমিত স্নান, আহার ও বিশ্রাম করা নিয়মের অঙ্গ।

(৩) আসন-বিশেষ ভঙ্গিতে বসাকে আসন বলে।

(৪) প্রাণায়াম-শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকে প্রাণায়াম বলে।

(৫) প্রত্যাহার- মনকে বহির্মুখ হতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করাকে প্রত্যাহার বলে।

(৬) ধারণা- কোনো এক বিষয়ে মনকে একাত্ম করা।

(৭) ধ্যান- কোনো এক বিষয়ে মনের অবিস্মিত চিন্তা।

(৮) সমাধি-ধ্যানস্থ অবস্থায় মন যখন ইন্টিন্সায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকে তখন সে অবস্থানকে বলা হয় সমাধি।

নিয়মিত যোগাসন করলে শরীর স্থির থাকে, অথচ কোনো ক্রেশের কারণ ঘটে না। যোগাসনের সংখ্যা অনেক, যেমন পদ্মাসন, বজ্রাসন, ভদ্রাসন, শবাসন ইত্যাদি।

এখানে দুটি আসনের পরিচয় দেয়া হচ্ছে-

## ১। পদ্মাসন

অনুশীলন পদ্ধতি : কোনো শক্ত জায়গায় বা মাটির ওপর বসতে হবে। ডান হাঁটু ভাঁজ করে বাঁ পায়ের উপর কাছে ডান পায়ের পাতা রাখতে হবে। এবার বাঁ হাঁটু ভাঁজ করে ডান পায়ের উপর দিয়ে বাঁ পা ডান পায়ের উপর কাছে রাখতে হবে। মেরুদণ্ড থাকবে সোজা, হাত দুটি থাকবে হাঁটুর উপর টান করা। ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। এভাবে সামর্থ্য মত কিছু সময় অনুশীলন করা দরকার। একাধিকবার পায়ের অবস্থান পরিবর্তন করে পদ্মাসন অনুশীলন করতে হয়। অনুশীলনের পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।



পদ্মাসন

### উপকারিতা

পদ্মাসন অনুশীলনে মনের একাগ্রতা বাড়ে। এছাড়া হাঁটু ও পায়ের গোড়ালির উপকার হয়। মেরুদণ্ডকে সুদৃঢ় ও সবল করে। পদ্মাসন পরোক্ষভাবে হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বাতরোগ প্রতিরোধ করে।

### বিশেষ সতর্কতা

বাতের ব্যথা, হাঁটু ও গোড়ালি-সন্ধির ব্যথা থাকলে পদ্মাসন সাবধানে অনুশীলন করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে আসন অনুশীলনের সময় বেশি চাপ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

### ২। শবাসন

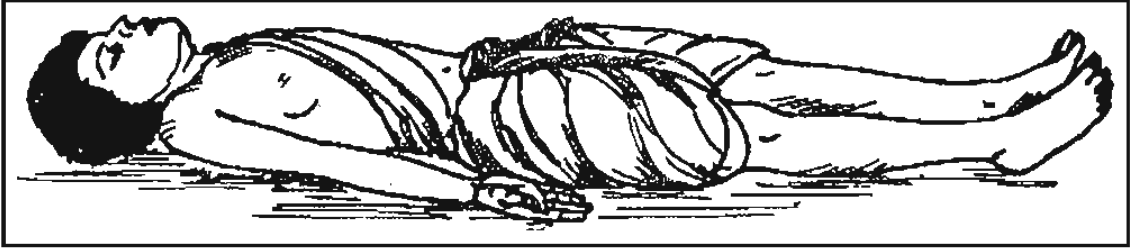
‘শব’ অর্থাৎ মড়ার মত নিশ্চলভাবে শুয়ে যে আসন করা হয় তার নাম শবাসন।

**অনুশীলন পদ্ধতি :** চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটি লম্বা করে দিতে হবে। দু’পায়ের মাঝে এক ফুট থেকে দেড় ফুট ফাঁক থাকবে। পায়ের গোড়ালি ভিতর দিকে এবং আঙ্গুলগুলো বাইরের দিকে থাকবে। হাত দুটি লম্বালম্বিভাবে নিজের সুবিধামত শরীরের দুপাশে রাখতে হবে। হাতের তালু থাকবে উপর দিকে এবং শরীরটা যতদূর সম্ভব আলগা করে দিতে হবে।

শ্বাসক্রিয়া ধীরে ধীরে চলবে। লক্ষ্য রাখতে হবে শরীরের কোন স্নায়ু এবং মাংসপেশী যেন বিন্দুমাত্র শক্ত না হয়ে থাকে।

### উপকারিতা

শবাসন দেহের স্নায়ুগুলোকে বিশ্রাম দেয়। মনের উত্তেজনা প্রশমিত করে, সবচাইতে বেশি বিশ্রাম পায় ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড। হৃদযন্ত্রের অসুখ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগ উপশমের ক্ষেত্রে শবাসন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।



শবাসন

যে কোনো আসনের পর শবাসন করা প্রয়োজন। তাতে উপকার বেশি হয়। এছাড়া আলাদাভাবে অন্তত ১৫ মিনিট শবাসন করা প্রয়োজন। তবে যাদের পক্ষে নির্ধারিত সময়ে শবাসন করা সম্ভব নয়, তারা একই পদ্ধতিতে চেয়ারে বসেও শবাসন করতে পারবে। এতেও শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূর হয়। নতুন উদ্যমে কাজ করার উৎসাহ জাগে।

### যোগাসনের সাধারণ নিয়ম

- (১) যোগাসন অনুশীলনের নির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার। সকাল ও সন্ধ্যায় যোগাসনের অনুশীলন করা ভালো।
- (২) আসন অভ্যাস করার সময় মনকে ধীর, স্থির ও শান্ত রাখতে হয়।
- (৩) ভরা পেটে অথবা একেবারে খালি পেটে আসন অভ্যাস করা ঠিক নয়। সামান্য কিছু হাফা খাবার খেয়ে কিছুটা সময় পরে যোগাসন অভ্যাস করতে হবে।
- (৪) নরম বিছানার উপর আসন অভ্যাস করা যাবে না। মেঝের উপর কব্জল, শতরঞ্জি বা ঐ জাতীয় কিছু পেতে আসন অনুশীলন করতে হবে।

যোগাসন অনুশীলনের উদ্দেশ্য দেহ ও মনকে ঈশ্বর আরাধনার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা। ঈশ্বর আরাধনার জন্য জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সাধন পদ্ধতি রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে যোগকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগী হতে বলেছেন। আর স্মরণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগীর শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর। সুতরাং সাধ্যমত যোগাসন অনুশীলন করা সকল সাধকেরই অবশ্য কর্তব্য।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ধর্মের জন্য প্রয়োজন—

- i ভাবাবেগ
- ii. অনুভূতি ও কল্পনা
- iii. ভক্তি ও শ্রদ্ধা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

২. হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে ধর্ম চেতনার উৎস, মানুষের হৃদয়ের—

- i. আবেগ
- ii. ভালোবাসা
- iii. শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. ii          |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. ধর্ম-দর্শনের কাজ হলো—

- ক. ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয়
- খ. কর্মের সাথে তত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয়
- গ. শিক্ষার সাথে কর্মের সম্পর্ক নির্ণয়
- ঘ. মানবতার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক নির্ণয়

৪. ধর্মেন্দু প্রত্যুষে স্নান করে গীতা পাঠ করছেন, ধর্মেন্দুর এ আচরণটি—

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ক. ধর্মীয় বিধি নিষেধ | খ. সামাজিক নিয়ম প্রথা |
| গ. ধর্মীয় আচার       | ঘ. ধর্মীয় চেতনা       |

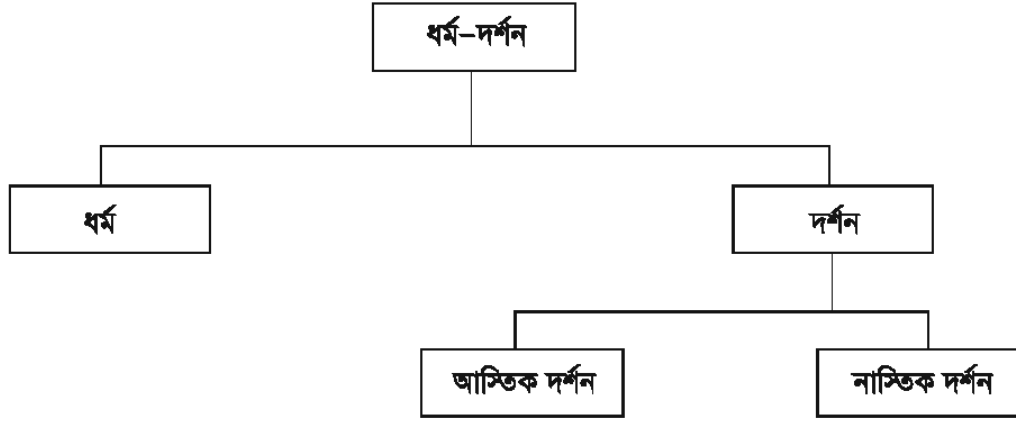
৫. মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ক. মোক্ষলাভ | খ. অর্থলাভ   |
| গ. ভক্তিলভ  | ঘ. সম্মানলাভ |

৬. ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতি—

- |          |         |
|----------|---------|
| ক. জ্ঞান | খ. কর্ম |
| গ. ভক্তি | ঘ. যোগ  |

## সৃজনশীল প্রশ্ন :



[ধর্ম-দর্শনের মূল কাজ হলো কল্যাণ ও মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশ]

- ক. ধর্ম-দর্শন কী?
- খ. উপরের ছকে ব্যবহৃত ধর্ম ও দর্শন কীভাবে সম্পর্কিত তা আলোচনা কর?
- গ. সমাজের প্রচলিত বিধি নিষেধ, ধর্মীয় আচার ও সামাজিক নিয়ম, প্রথা চিহ্নিতকরণ যা ধর্ম-দর্শনের বিষয় - আলোচনা কর।
- ঘ. “ধর্ম-দর্শনের মূল কাজ হলো কল্যাণ ও মোক্ষলাভে উপায় নির্দেশ করা”-কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

২.



- ক. চিত্রে প্রদর্শিত আসনটি কী?
- খ. উক্ত আসনটি কীভাবে শরীর ও মন ভালো রাখে বুঝিয়ে লেখ।
- গ. তুমি কীভাবে উক্ত আসনটি অনুশীলন করবে?
- ঘ. “শরীর ও মন সুস্থ রাখার প্রক্রিয়া হলো যোগাসন”- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।



## চতুর্থ অধ্যায়

### ধর্মগ্রন্থ

আমরা জানি, যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। ধর্মগ্রন্থে থাকে ঈশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। এছাড়া যাতে আমাদের মজল হয় এমন উপদেশও থাকে। এ সকল উপদেশ যে কেবল সরাসরি দেয়া হয় তা নয়। গল্প বা কাহিনীর আকারে বা ইতিহাসের ঘটনা উল্লেখ করেও উপদেশ দেয়া হয়। ধর্মগ্রন্থে জীবন-যাপনের বিধিবিধানও থাকে।

বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচণ্ডী প্রভৃতি আমাদের ধর্মগ্রন্থ। এখানে আমরা সংক্ষেপে বেদ ও গীতা সম্পর্কে জানব।

### বেদ

আগেই বলেছি, আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। ‘বেদ’-এর শাব্দিক অর্থ জানা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পবিত্র জ্ঞান। এই জ্ঞান বিচিত্র ও সুন্দর প্রকৃতি এবং এর স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান। এই জ্ঞান চারপাশের মানুষ ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান। জ্ঞানের কি শেষ আছে? জ্ঞান কি এমনি এমনি পাওয়া যায়? তার জন্য চেষ্টা করতে হয়, সাধনা করতে হয়। ডুবে যেতে হয় সাধনায়। গভীর চিন্তায় এই ডুবে যাওয়া বা নিমগ্ন হওয়াকে বলে ধ্যান। ধ্যানে সত্য ধরা দেয়। সত্য চিরন্তন, সনাতন। যা সনাতন তার অন্ত নেই। এই সত্য সৃষ্টি করা যায় না, এই সত্য গভীর ধ্যানের আলোতে দর্শন করা যায়, উপলব্ধি করা যায়।

প্রাচীনকালে যারা সত্য বা জ্ঞান এবং স্রষ্টার মাহাত্ম্য দর্শন করতে পারতেন তাদের বলা হত ঋষি। বেদ এই ঋষিদের ধ্যানলব্ধ পবিত্র জ্ঞান। সত্য বা জ্ঞান সৃষ্টি করা যায় না বলে বেদকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয়। অর্থাৎ কোন পুরুষ বা ব্যক্তি তা রচনা করেননি। তবে রচনা না করলেও ধ্যানের মাধ্যমে ঋষিরা সেই সত্য দর্শন করে তাকে ভাবের আবেগে প্রকাশ করেছেন। এ কথা মনে রেখেই বলা হয়, বেদ সৃষ্ট নয়, দৃষ্ট। অর্থাৎ বেদ কেউ সৃষ্টি করেননি, উপলব্ধি করেছেন মাত্র। এই পরম জ্ঞান বা বেদ ধর্মের মূল। মনু নামক একজন ঋষি বলেছেন, ‘বেদঃ অখিলধর্মমূলম্’-বেদ অখিল ধর্মের মূল। বেদ পাঠ করলে ধর্ম এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে জানা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। বেদের বিষয়কে বলা হয়েছে দেবতা। ঋষিরা দেবতাদের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। তাঁদের স্তুতি বা প্রশংসা করেছেন এবং অসাধারণ শক্তি ও প্রভাবসম্পন্ন দেবতাদের কাছে ধন-সম্পদ, সুখ ও শান্তি প্রার্থনা করেছেন। বেদের বাক্যকে মন্ত্রও বলা হয়। ঋষিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে ধর্মানুষ্ঠান বা উপাসনা করেছেন। বৈদিক উপাসনা পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোম করা। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলছি। ঋষিরা বেদের দেবতাদের প্রধান তিন ভাগে ভাগ করেছেন- (১) স্বর্গের দেবতা। এঁদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। যেমন-সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি (২) অন্তরীক্ষের দেবতা-যাদের ক্ষমতা বোঝা যায়। দেখাও যায়। যেমন, ইন্দ্র, বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। বায়ু পৃথিবীতে আসেন, কিন্তু অবস্থান করেন না। আর (৩) মর্ত্যের দেবতা-মর্ত্যের বা পৃথিবীর দেবতা হলেন অগ্নি। অগ্নিকে আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই। আর তাই তাঁর কাছে ভালো ভালো জিনিস উৎসর্গ করে তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য দেবতাকে আহবান করা হয় এবং তাঁরই মাধ্যমে ঐ সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। এই যে আগুন জ্বলে বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের আহবান জানানো এবং প্রার্থনা করা, একেই বলে যজ্ঞ। বেদে রয়েছে এই রকম যজ্ঞে ব্যবহার করার মন্ত্র।

এছাড়া বেদের বাক্যে সুর দিয়ে যজ্ঞের সময় গান করা হয়েছে। বেদে রয়েছে এই রকম কিছু গান। এই গানকে সেকালে বলা হত সাম।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিচিত্র জ্ঞানের কথাও বেদে রয়েছে।

এই ধরনের বিষয়বস্তু ও রচনা রীতির পার্থক্য সামনে রেখে বেদকে বিভক্ত করেছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। বেদকে তিনি বিভক্ত করেছেন বলে তাঁকে বলা হয়েছে বেদব্যাস। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেছে। বেদকে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

(১) ঋগ্বেদ-ঋগ্বেদে রয়েছে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। এগুলো পদ্যে রচিত বা এক ধরনের কবিতা।

(২) সামবেদ - এই বেদে সংগৃহীত হয়েছে গান। সামবেদের প্রায় পুরোটা জুড়ে রয়েছে ঋগ্বেদ থেকে নেয়া কবিতা এবং তাতে সুর দিয়ে গান বানানো হয়েছে। যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই গান গাওয়া হয়।

(৩) যজুর্বেদ-যজুর্বেদে রয়েছে এমন কিছু মন্ত্র যেগুলো যজ্ঞ করার সময় উচ্চারিত হয়।

(৪) অথর্ববেদ- চিকিৎসা বিজ্ঞান, বাস্তুকলা বা বাড়ি বানানোসহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের জ্ঞান নিয়ে সংকলিত হয়েছে অথর্ববেদ।

এই যে বেদের চারটি ভাগ, এর একেকটি ভাগকে সংহিতা বলে। যেমন, ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ইত্যাদি। বেদের আরেক নাম শ্রুতি। যা শোনা হয় তাকেই বলে শ্রুতি। গুরুর মুখ থেকে বেদমন্ত্র শুনে শিষ্য তা মনে রাখতেন। তাঁর শিষ্য আবার তাঁর কাছ থেকে শুনত। এভাবে শুনে শুনে মনে রাখা হত বলেই বেদকে শ্রুতি বলা হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংহিতা বা চার বেদের পর বেদের ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যাখ্যাকে বলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের আবার তিনটি অংশ- যজ্ঞের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা হল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। আর স্রষ্টা ও সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞানের কথা নিয়ে আরণ্যক ও উপনিষদ। উপনিষদে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বেদের অন্ত ভাগ বলে উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ইত্যাদি নিয়ে বিশাল বৈদিক সাহিত্য। উপরের আলোচনায় সংক্ষেপে ধারণা দেয়া হয়েছে মাত্র।

### গীতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শ্রীমদভগবদ্গীতাকে সংক্ষেপে গীতা বলে। আগেই বলেছি মহাভারতের অংশ হয়েও গীতা পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। মহাভারতের আঠারটি পর্বের অন্তর্গত একটি পর্ব হচ্ছে ভীষ্মপর্ব। গীতা এই ভীষ্মপর্বের ২৫ থেকে ৪২-এই আঠারটি অধ্যায়।

### এই আঠারটি অধ্যায়ের নাম হচ্ছে।

(১) অর্জুনবিষাদযোগ (২) সাংখ্যযোগ (৩) কর্মযোগ (৪) জ্ঞানযোগ (৫) সন্ন্যাসযোগ (৬) ধ্যানযোগ (৭) জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ (৮) অক্ষরব্রহ্মযোগ (৯) রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ (১০) বিভূতিযোগ (১১) বিশ্বরূপদর্শন যোগ (১২) ভক্তিযোগ (১৩) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ (১৪) গুণত্রয়বিভাগযোগ (১৫) পুরুষোত্তমযোগ (১৬) দেবাসুরসম্পদ-বিভাগযোগ (১৭) শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ ও (১৮) মোক্ষযোগ।

### গীতার বিষয়বস্তু

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড়, পাণ্ডু ছোট। ধৃতরাষ্ট্রের একশ ছেলে আর এক মেয়ে। যেমন- দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি ও মেয়ে দুঃশলা। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে-যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব। কুরু বংশের নাম অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলা হয় কৌরব। আর পাণ্ডুর নাম অনুসারে তাঁর ছেলেদের বলা হয় পাণ্ডব। রাজ্য নিয়ে এই কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অবতাররূপে দ্বারকার রাজা ছিলেন। তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ করতে দিয়েছেন কৌরবদের পক্ষে। আর নিজে নিরস্ত্র অবস্থায় অর্জুনের রথের সারথি হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রথ যখন দুপক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হল তখন অর্জুন সপক্ষে ও বিপক্ষে নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দেখে মুষড়ে পড়লেন। এসব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করবেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশবাণী গীতায় বিধৃত। তাঁর উপদেশ শুনে অর্জুন যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হন।

উপলক্ষ অর্জুন হলেও গীতায় শ্রীভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। গীতায় যা বলা হয়েছে তা পুরোপুরি বোঝা অসম্ভব। নানাদিক থেকে নানাভাবে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং করা হয়েছেও। এখানে সংক্ষেপে গীতার উপদেশ সম্পর্কে বলছি।

গীতায় দুর্বলতা পরিহার করে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং ফলের আশা না করে নিজের কাজ করতে বলা হয়েছে। কাজটাই বড়, ফল যাই হোক। এই ফলের আশা না করে কাজ করাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। বলা হয়েছে সব ধর্ম সমন্বয়ের কথা।

অর্জুন যে আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে চাইছেন না এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। এর কারণ আমাদের জন্ম, বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে। সুতরাং কারো মৃত্যু অর্জুনের যুদ্ধ না করার ওপর নির্ভর করে না। এমনকি অর্জুন নিজেই কি জানেন কখন তাঁর মৃত্যু ঘটবে। তাছাড়া ঈশ্বরই আত্মারূপে আমাদের মধ্যে থাকেন। তাই মৃত্যুর দ্বারা দেহের ধ্বংস হলেও, আত্মার ধ্বংস হয় না। আত্মাকে অগ্নি, বায়ু, জল কেউ ধ্বংস করতে পারে না। আত্মা সনাতন, অবিনশ্বর। আত্মাকে এভাবে জানতে পারলে আর দুঃখ থাকে না। তখন সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় সমান হয়ে যায়। গীতায় যোগের কথা বলা হয়েছে। যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল বা উপায়। নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যিনি ঈশ্বরের জন্য সাধনা করেন তাকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বলেছেন। ভক্ত চার রকম, যথা-আর্ত, অর্থাধী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভক্ত। যিনি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে ডাকেন, তিনি আর্তভক্ত। যিনি কোনো ইচ্ছে বা প্রার্থনা পূরণের জন্য ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে অর্থাধী ভক্ত বলা হয়। যিনি জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে চান তিনি হচ্ছেন জিজ্ঞাসু ভক্ত। আর যিনি কোনো কিছু পেতে না চেয়ে কেবল ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং তজ্জন্য তাঁকে ডাকেন, তাঁকে জ্ঞানীভক্ত বলা হয়।

যে যেভাবে বা যে পথে ঈশ্বরকে ডাকতে চায় ডাকুক। ঈশ্বর সেভাবেই তার ডাকে সাড়া দেন। এখানেই বেজে ওঠে ধর্মসমন্বয়ের সুর।

গীতা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়বার প্রেরণা দেয়। কারণ স্রষ্টা ভগবানই যুগে যুগে দুষ্টির দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার জন্য পৃথিবীতে অবতাররূপে নেমে আসেন। আত্মার ধ্বংস নেই, গীতার এই শিক্ষা আমাদের মৃত্যুকে ভয় না করে ভালো কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহায্য যোগায়।

গীতায় বলা হয়েছে, (১) শ্রদ্ধাবান ও সংযমীই জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। (২) অনাসক্ত কর্মযোগী মোক্ষলাভ করেন (৩) জ্ঞানী ভক্তই তাকে হৃদয়ে অনুভব করেন এবং (৪) এই বিশাল বিশ্বে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যা কিছু আছে, সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান।

গীতার এই কথা থেকে আমরা শ্রদ্ধা ও সংযম সাধনার দিকে মনোনিবেশ করি। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্মোহ হবার প্রেরণা পাই। ধর্ম অনুশীলনের কাজে বিচারে প্রবৃত্ত হই অর্থাৎ অর্থহীন গতানুগতিক পথ পরিহার করে তত্ত্বের মর্মার্থ বুঝবার চেষ্টা করি। সবকিছু শ্রীভগবানের অন্তর্গত ভেবে ভেদবুদ্ধি দূর করে দিয়ে অন্যকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি।

গীতায় সকল উপনিষদের সারকথা-ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণা এক জায়গায় সমন্বিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। গীতামাহাত্ম্যে তাই বলা হয়েছে সকল উপনিষদ যেন গান্ধী স্বরূপ, আর দুগ্ধ হচ্ছে গীতা। গোবৎস যেমন একটু একটু আঘাত করে দুধ বের করে, অর্জুন তেমনি সেই গোবৎসের মত প্রশ্ন করে আঘাত করেছেন। আর গীতারূপ দুধ দোহন করছেন অর্থাৎ গীতারূপ জ্ঞানের কথা বলছেন স্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

গীতায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে বাস্তব জীবনে কিভাবে চলতে হবে সেই পথও দেখানো হয়েছে। এসব দিক থেকে হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গীতার গুরুত্ব অপরিসীম।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বেদ ধর্মের মূল কথাটি বলেছেন—  
 ক. মনু  
 গ. ইন্দ্র  
 খ. বিশ্বামিত্র  
 ঘ. অর্জুন
২. বেদের বিভাগ চারটি হলো—  
 ক. ঋক্, সথহিতা, যজু, অথর্ব  
 গ. ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব  
 খ. গীতা, সথহিতা, সাম, আরণ্যক  
 ঘ. মনুসথহিতা, আর্য, সাম, অথর্ব
৩. ‘এই বিশাল বিশ্বে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যা কিছু আছে, সবই ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান’। –একথা বলা হয়েছে—  
 ক. মহাত্মারতে  
 গ. গীতায়  
 খ. পুরাণে  
 ঘ. উপনিষদে
৪. যিনি কোনো ইচ্ছা বা প্রার্থনা পূরণের জন্য ঈশ্বরকে ডাকেন তিনি হলেন—  
 ক. আর্তভক্ত  
 গ. জিজ্ঞাসু  
 খ. অর্থার্থী  
 ঘ. জ্ঞানী
৫. তুমি ধর্মগ্রন্থ পাঠে কী জানবে?  
 i. ঈশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা  
 ii. মঙ্গল হয় এমন উপদেশ  
 iii. জীবন যাপনের বিধি বিধান

### নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
 গ. iii  
 খ. ii  
 ঘ. i, ii ও iii
৬. নিতাই বাবু মন্ত্রাদির মাধ্যমে যাগযজ্ঞ করেন, এই কার্য কোন বেদের অন্তর্ভুক্ত?  
 ক. ঋগ্বেদ  
 গ. যজুর্বেদ  
 খ. সাম বেদ  
 ঘ. অথর্ব বেদ

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিদিতা ও সম্পদ দুই ভাই বোন। তারা দুজনই ডাক্তারি পড়ছে। বিদিতার স্বপ্ন সে পড়া শেষ করে জনগণের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু সম্পদের ইচ্ছা, সে পড়াশুনা শেষ করে অনেক অর্থ ও সম্পদের মালিক হওয়ার চেষ্টা করবে।

৭. বিদিতার এ কর্মটি—  
 i. সকাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত  
 ii. নিষ্কাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত  
 iii. নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |            |
|--------|------------|
| ক. i   | খ. ii      |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

৮. সম্পদের ডাক্তার হবার পেছনে সকাম কর্ম কাজ করছে কারণ সে—

- ধনী হতে চায়
- যশ ও খ্যাতি চায়
- পরোপকার করতে চায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |           |
|--------|-----------|
| ক. i   | খ. ii     |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. কুরুক্ষেত্রের মাঠে এসে অর্জুন যুদ্ধ করতে না চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। অর্জুন বুঝলেন কর্মেই তাঁর অধিকার। আর কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণযোগ্য। তাছাড়া কার কখন মৃত্যু হবে কেউ জানে না। আর মৃত্যু হলেও আত্মার ধ্বংস হয় না, কারণ ঈশ্বর আত্মারূপে সকলের মধ্যে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অর্জুনকে মুগ্ধ করল।

- অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাণী কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে?
- অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না কেন?
- কর্ম সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাণী তুমি কীভাবে ব্যক্তি জীবনে কাজে লাগাবে?
- কর্ম সম্পর্কে অর্জুনকে দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাণীর মূল কথা লেখ।

## পঞ্চম অধ্যায়

# দেব-দেবী

আমরা জানি দেবতারা বিভিন্ন শক্তির অধিকারী। যেমন-ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু আমাদের পালন করেন, দুর্গা শক্তির দেবী, লক্ষ্মী আমাদের ধন সম্পদ দান করেন, সরস্বতী আমাদের বিদ্যা দেন।

দেব-দেবীরা আলাদা গুণ ও শক্তির অধিকারী হলেও তাঁরা ঈশ্বর নন। ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু তিনি যে কোনো আকার বা রূপ ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বর যখন কোনো রূপ বা আকার ধারণ করে সাকার হয়ে ওঠেন এবং বিশেষ গুণ, শক্তি বা মহিমা প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে।

দেবতারা ঈশ্বরের বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার সাকার রূপ। তা হলে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, কার্তিক প্রভৃতি দেব-দেবী এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ।

আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ‘পুরাণ’ নামক ধর্ম গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। এই বেদ ও পুরাণে দেব-দেবীর রূপ, শক্তি, প্রভাব এবং সামাজিক গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া আরও কিছু দেবতা রয়েছে, বেদ ও পুরাণে যাঁদের উল্লেখ নেই। কিন্তু ভক্তগণ যুগ যুগ ধরে তাঁদের পূজা করে আসছেন। এভাবে আমরা তিন প্রকার দেব-দেবীর পরিচয় পাই— (১) বেদে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন বৈদিক দেবতা, (২) পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁরা পৌরাণিক দেবতা এবং (৩) বেদে ও পুরাণে যে সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু পূজা করা হয়, তাদেরকে বলা হয় লৌকিক দেবতা। বৈদিক অনেক দেবতার উল্লেখ পুরাণেও আছে। আবার কিছু কিছু লৌকিক দেবতার কথাও পরে পুরাণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অগ্নি, সূর্য, বিষ্ণু, বরুণ, উষা প্রভৃতি বৈদিক দেবতা। বিষ্ণু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ পুরাণেও আছে। মনসা লৌকিক দেবতা। পরে পুরাণেও মনসা দেবীর কথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমরা গৃহে বা মন্দিরে দেবতার মূর্তি স্থাপন করি। তারপর প্রতিদিন বা বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা করি। দেব-দেবীদের পূজা করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি, বিধি ও মন্ত্র রয়েছে। এখানে আমরা বিষ্ণু, মনসা ও কার্তিক এই তিনজন দেবতার পরিচয় দিচ্ছিঃ

### বিষ্ণু

ঈশ্বর যেভাবে তার সৃষ্টিকে পালন করেন তাঁর নাম বিষ্ণু। অন্য কথায়, ঈশ্বরের পালন করার শক্তিই বিষ্ণু। এই বিংশে যা কিছু আছে বিষ্ণু তা পালন করেন, রক্ষা করেন।

### বিষ্ণুর রূপ

বিষ্ণুর চার হাত। চার হাতে চারটি দ্রব্য রয়েছে। উপরের দিককার বাঁ হাতে শঙ্খ এবং ডান হাতে চক্র। বিষ্ণুর এই শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। আর চক্রের নাম সুদর্শন। নিচের দিকের বাঁ হাতে গদা। ডান হাতে পদ্ম। বিষ্ণুর গায়ের রঙ চাঁদের আলোর মত। পুরাণে আছে, বিষ্ণু বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন। তাঁর বাহনের নাম গরুড় পাখি।

### বিষ্ণু পূজার সময়

সকল পূজা করার সময় বিষ্ণুর পূজা করা হয়। বিষ্ণু পূজার কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই। যে কোনো দিন আমরা বিষ্ণুর পূজা করতে পারি। বিপুলসংখ্যক ভক্ত বিষ্ণুর উপাসনা করেন। যাঁরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁদের বৈষ্ণব বলা হয়।



বিষ্ণু

### বিষ্ণুর কৃতিত্ব ও প্রভাব

বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন। দেবতারা যখন বিপদে পড়েন তখন তারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর আরেক নাম নারায়ণ। দুষ্টকে দমন করে শিষ্টকে পালন করার জন্য বিভিন্ন রূপ ধরে অনেকবার তিনি পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণে তাঁর নানা অবতারের কথা বলা হয়েছে। যেমন মৎস্য, কূর্ম, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম ইত্যাদি।

বিভিন্ন অবতारे বিষ্ণু পৃথিবীর অনেক মজল করেছেন। মধু ও কৈটভ, হিরণ্যকশিপু, শিশুগাল, কংস প্রভৃতি দৈত্য পৃথিবীতে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। কলুষিত করেছিল বিশ্বের পরিবেশ। বিষ্ণু দৈত্যদের দমন করে বা হত্যা করে পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।

বিষ্ণু পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে পাপ দূরীভূত হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। মনে শান্তি আসে। ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধায় শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন। তাঁর মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁকে প্রণাম জানান।

### বিষ্ণু প্রণাম

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।

জগন্নিধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

**সরলার্থ :** ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার। গো, পৃথিবী, ব্রাহ্মণ এবং জগতের হিতকারী বা মজলকারী কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে বারবার নমস্কার।

### মনসা

মনসা সর্পের দেবী। তিনি সর্পকুলের জননী। কেউ কেউ তাঁকে কৃষির দেবীও বলেছেন। তবে সাপের দেবীরূপেই তার পরিচয় ও পূজা প্রচলিত। মনসা লৌকিক দেবী। পরে পৌরাণিক দেবীরূপে পরিগণিত হয়েছেন। পুরাণ মতে, তিনি জয়ৎকার্য মুনির পত্নী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভাগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে ঋষি বশিষ্ঠ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করেন এবং তাঁর উপস্যার দ্বারা মন থেকে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব ঘটে। মন থেকে সাকার রূপ লাভ করেছেন বলে এর নাম হয়েছে মনসা।

### মনসা দেবীর রূপ

মনসা দেবী গৌরবর্ণা। এর আরেক নাম তাই জগৎগৌরী। চন্দের মত সুন্দর এবং প্রসন্ন তাঁর মুখমণ্ডল। অরুণ বর্ণের অর্ধাং ডোলের সূর্যের আলোর মত লাল রঙের কাপড় তিনি পরিধান করেন। তিনি সোনার অলংকার পরে থাকেন। কয়েকটা সাপ তাঁকে জড়িয়ে থাকে, যেন তাঁর অলংকার। প্রসন্ন মুখে তিনি হাঁসের ওপর বসে থাকেন। অর্ধাং হাঁস তাঁর বাহন।



মনসা

### মনসা দেবীর পূজার সময়

আষাঢ়মাসের পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী তিথি তাকে নাগপঞ্চমী বলে। নাগপঞ্চমীতে উঠোনে সিঁজ গাছ স্থাপন করে তাতে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী পর্যন্ত মনসা দেবীর পূজা করার বিধান রয়েছে।

### মনসা দেবীর প্রভাব ও গুরুত্ব

মনসা দেবীর পূজা করলে সাপের ভয় থাকে না। মনসা দেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক উপাখ্যান রচিত হয়েছে। এ সকল উপাখ্যানে মনসা দেবীকে পূজা না করার ভয়াবহ পরিণাম এবং পূজা করার সুফল বর্ণিত হয়েছে। মনসা দেবীর পূজার সময় এ সকল উপাখ্যান শোনানো হয়। এরূপ উপাখ্যান অবলম্বনে অনেক পালাগানও রচনা করা হয়েছে। মনসার ভাসান এরকম একটি পালাগান।

### কার্তিক

কার্তিকের পুরো নাম কার্তিকেয়। সংক্ষেপে কার্তিক বলেই সবাই এই দেবতাকে ডাকে।

### কার্তিকের রূপ

অত্যন্ত সুন্দর তাঁর চেহারা। তাইতো লোকে কথায় বলে কার্তিকের মত চেহারা। তাঁর গায়ের রং তন্তস্বর্ণের মত। সেই সুন্দর গায়ে নানা রকমের অলংকার। তাঁর দুই হাত। সাধারণভাবে কার্তিকের মুখ একটি দেখা গেলেও তাঁর ছয়টি মুখযুক্ত একটি রূপও রয়েছে। ছয়টি মুখ থাকার কারণে কার্তিককে ষড়ানন বলা হয়। তাঁর হাতে থাকে তীর ধনুক। সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত হয়েছে অসীম শক্তি। তাই দেবতারা তাঁকে তাঁদের সেনাপতি পদে বরণ করেছেন। প্রসন্ন বদনে কার্তিক ময়ূরের ওপর বসে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর বাহন হচ্ছে ময়ূর।

### কার্তিকের পূজার সময়

কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা করা হয়। চার প্রহরে চারবার পূজা ও ব্রতকথা শ্রবণের ব্যবস্থা আছে; সম্ভব না হলে একবারেই পূজার কাজ করা হয়ে থাকে। দুর্গা পূজার সময় কার্তিকের পূজাও করা হয়।

দেবসেনাপতি কার্তিক দেবতা এবং তাঁদের শত্রু অসুরদের মধ্যকার প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। পুরাণে আছে, তারকাসুরকে বধ করার জন্য কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তিনি বাণাসুরকে পরাজিত করেছেন।

কার্তিকের পূজা করে তাঁর কাছে সম্ভ্রান প্রার্থনা করা হয়। কথিত আছে, দেবকী কার্তিকের ব্রত করে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে কার্তিকের অনেক মন্দির আছে। প্রাচীনকালে বেশ কিছু রাজা তাদের টাকায় কার্তিকের মূর্তি খোদাই করে দিয়েছিলেন। স্কন্দ বা কার্তিকের নামানুসারে স্কন্দপুরাণ নামে একটি পুরাণ রয়েছে।



কার্তিক



ঘ. 'দেব-দেবীরা আলাদা গণ ও শক্তির অধিকারী হলেও তাঁরা ঈশ্বর নন'।-কথাটি বঝিয়ে লেখ।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# পূজা-পার্বণ

‘পূজা’ শব্দটির মানে হল আরাধনা, অর্চনা বা উপাসনা। পূজা করা মানে প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বা কোন রূপ বা চিহ্নকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্চনা করা। আমরা জানি, ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু তিনি সাকার হতে পারেন এবং ঈশ্বরের সাকার রূপকেই দেবতা বলে। দেবতার ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তি। দেবতাদের প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করা হয়। প্রতিমা মানে মূর্তি।

ভক্ত ঈশ্বরকে দেখতে তাঁকে কাছে পেতে বা তাঁর কাছে মনের আবেগ জানাতে চায়। ভক্তের এই বাসনা পূরণ করার জন্য পূজা বা অর্চনা প্রচলিত হয়েছে।

সুতরাং ঈশ্বরের গুণের প্রকাশক বা পরিচায়ক দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য সেবা, গুণকীর্তন, প্রার্থনা ও প্রণাম জানাতে যে অনুষ্ঠানাদি করা হয় তাকেই পূজা বলে। আর পার্বণ বলতে বোঝায় পর্ব বা উৎসব।

ধর্মের যেমন তত্ত্ব বা শাস্ত্রগত দিক আছে, ধর্ম কী এ কথার ব্যাখ্যা আছে, তেমনি কীভাবে ধর্ম পালন করা হবে, তারও আচরণগত দিক এবং আনুষ্ঠানিকতা আছে। পূজা হিন্দু ধর্মের বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা বা আচরণগত দিককে প্রকাশ করে। পূজার সাথে তাই কীভাবে পূজা করা হয়, কীভাবে প্রতিমা বা প্রতীক নির্মাণ করা হয়, এসব বিধিবিধানের যোগ রয়েছে। পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা, ঈশ্বরকে কাছে পাওয়া। দেবতার মধ্য দিয়ে সেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। দেবতার মূর্তির মধ্যে তখন দেবতার শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে এই বোধ জাগ্রত হয়। তখন ভক্ত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং বিভোর হয়ে থাকে ঈশ্বরের শক্তির ধ্যানে। এই আত্মসমর্পণ মূর্তিপূজার লক্ষ্য। তাই বলা হয়েছে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার ও জ্যোতির্ময়। ভক্তের হিতের জন্য তাঁর রূপ কল্পনা করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিমাপূজা সম্পর্কে বলেছেন :

‘পুতুলপূজা করে না হিন্দু,

কাঠ মাটি দিয়ে গড়া

মুন্সুয়া মাঝে চিনুয়া হেরে

হয়ে যাই আত্মহারা॥

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে বিভিন্ন দেবতার পূজা করার ইঙ্গিত রয়েছে। গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন :

‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাৎসত্বেভব ভজাম্যহম্।’ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি। পূজায় উপাসক ও উপাস্য অর্থাৎ ভক্ত ও দেবতা উভয়েরই আনন্দ হয়। এই আনন্দ আরও বেড়ে যায় যখন সকলে মিলে পূজা করা হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূজা-পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলন ও কল্যাণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মন্দির, প্রতিমা, পূজার উপকরণ, মন্দিরের সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি, প্রদীপ, পরিচ্ছন্ন পোশাক, সব মিলিয়ে বেশ একটা পবিত্র পরিবেশ তৈরি হয়। এই পবিত্রতা মানুষকে পবিত্র করে, তার মনকে সুন্দর করে, তার মধ্যে দ্রাতৃত্বের ভাব জাগ্রত হয়। পূজার মধ্য দিয়ে দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত হয়। ভক্তিতেই মুক্তি। হৃদয়ে দ্রাতৃত্ব ও ভক্তির ভাব জাগ্রত হলে মানুষ হিংসা-দ্বন্দ্ব ভুলে যায়। মিলনের অবাধ আনন্দে পূজা সার্থক হয়।

বিভিন্ন দেবতা পূজার জন্য বিভিন্ন প্রকার মূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে মূর্তি শিল্পের উন্নতি হয়। পূজা উপলক্ষে ধর্মীয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও কর্মকাণ্ডের বিকাশ ঘটে। বস্তুত পূজা পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলন ও কল্যাণ হয় এবং দেবতার পূজাকে উপলক্ষ করে ধর্মভাবও জাগ্রত হয়।

প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস বা বছরের বিশেষ সময়ে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। এই পূজার বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি আছে। তবে পূজা করার সময় কতকগুলো করণীয় আছে যেগুলো সকল পূজার সময়ই করে নিতে হয়। তারপর যে দেবতার পূজা করা হচ্ছে তাঁর ধ্যান করে পূজা করা হয়। আমরা এখানে সাধারণ পূজাবিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

### সাধারণ পূজাবিধি

**পূজার আধার :** ঘট, পট (ফটো), প্রতিমা, পুস্তক, শালগ্রাম, অগ্নি, জল প্রভৃতি পূজার আধার। এ সকল আধারে পূজা করা হয়।

**পূজাবিধি :** পূজা অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট বিধি বা নিয়মাবলি রয়েছে। কোনটার পর কোনটা করতে হবে তার ক্রম বা ধারাবাহিকতার নিয়ম-পদ্ধতি আছে। তাই পূজার বর্ণনা শোনার চেয়ে তা দেখে শেখা বেশি সহজ। কারণ পূজার কাজটির বেশিরভাগই ব্যবহারিক। তবুও আমরা অতি সংক্ষেপে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মূল বিষয়গুলোর কথা বলছি। শুম্ভ আসনে বসে প্রথমে আচমন করতে হয়। আচমনের সাথে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে হয়। বিষ্ণুস্মরণের পর ঋস্তিবাচন। ঋস্তি অর্থ মঙ্গল বা শুভ কামনা বা আশীর্বাদ। ব্রাহ্মণ পূজার শুরুতে যে শুভ বা মঙ্গল কামনা করেন তাকেই বলে ঋস্তিবাচন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ অনুসারে পৃথক পৃথক ঋস্তিবাচন রয়েছে। তারপর চন্দন, বেলপাতা, পুষ্প প্রভৃতি দিয়ে নারায়ণের অর্চনা করতে হয়, সূর্যের প্রতি দিতে হয় অর্ঘ্য যাকে সূর্যর্ঘ্য বলে। এরপরে সংকল্প করতে হয়। সংকল্প মানে প্রতিজ্ঞা। দৃঢ় ইচ্ছা যে আমি এই কাজ বা পূজা সম্পন্ন করব। অতঃপর সামান্যার্ঘ্য দিতে হয়। জল, আসন, পুষ্প প্রভৃতি শুম্ভ করে নিতে হয়। পূজার কাজের সুবিধার জন্য বিঘ্ন অপসারণ, ভূতশুম্ভি প্রভৃতি করে নিতে হয়। তারপর কিছু যোগের ব্যবস্থা আছে। যেমন, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি।

এসব হয়ে গেলে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করতে হয়। তারপর শিবাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করতে হয়। যিনি পূজা সম্পাদন করেন তাঁকে পুরোহিত বলা হয়। পুরোহিতদের জন্য পূজা পদ্ধতি বিষয়ক বহু গ্রন্থ আছে। সেগুলোতে পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সাধারণ পূজাবিধি অনুসারে পূজার কাজগুলো করার পর যে দেবতার পূজা করা হবে, সেই দেবতার ধ্যান করতে হয়। তারপর তাঁকে আবাহন করতে হয়। ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ, মম পূজ্যং গৃহাণ। হে দেবতা এখানে এস, এখানে অবস্থান কর, আমার পূজা গ্রহণ কর। এই ধ্যান কাকে বলে? পূজার ক্ষেত্রে ধ্যান হচ্ছে রূপচিন্তা। যে দেবতার পূজা করতে হবে তার রূপচিন্তা করাকেই ধ্যান বলা হয়। ধ্যানের মন্ত্রে দেবতাদের রূপ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনা অনুসারে ধ্যান করতে হয়। যথাসাধ্য উপচার দিয়ে পূজা করতে হয়। উপচার মানে উপকরণ। উপচার তিন প্রকার যথা

(ক) পঞ্চোপচার-গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

(খ) দশোপচার-পাদ্য (পা ধোয়ার জল), অর্ঘ্য, আচমনীয় (মুখ ধোয়ার জল), পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, ধূপ, দীপ নৈবেদ্য ও পানীয়।

(গ) ষোড়শোপচার-আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পুনরাচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানীয়।

যথাসাধ্য উপচার দিয়ে পূজা করার পর দক্ষিণা (গুরু বা পুরোহিতদের সম্মানী) দিতে হয়। তারপর পূজায় কোনো ত্রুটি ঘটে থাকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

অবশেষে সর্বকর্ম সমর্পণ। প্রণামের মধ্যদিয়ে আত্মনিবেদন।

এখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর পূজা পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

## লক্ষ্মীপূজা

লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। লক্ষ্মীপূজা নিত্য পূজা। প্রত্যেক হিন্দু বাড়িতেই লক্ষ্মীপূজা করা হয়। প্রতিদিন মেয়েরা পটে বা ছবিতে লক্ষ্মীপূজা করে। প্রতি বৃহস্পতিবার ঘটে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। ফুল, বেলপাতা এবং ফল-মিষ্টি প্রভৃতি নৈবেদ্যরূপে দেয়া হয়। তারপর লক্ষ্মীর মাহাত্ম্যপ্রকাশক পাঁচালী আছে। সেই পাঁচালী পড়া হয়।

প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করলে, চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করতে হয়। চক্ষুদান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্যও মন্ত্র আছে। অনুভব করা হয় যেন প্রতিমায় দেবী এলেন। পরে পূজা শেষে বিসর্জন দিতে হয়। যেন দেবী চলে গেলেন।

আশ্বিন মাসের শুরূপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ করে ঘটা করে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা হয়। এই পূর্ণিমাকে লক্ষ্মী পূর্ণিমা বা কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। দুর্গাপূজার সাথেও লক্ষ্মীপূজা করা হয়। যে দেবতার পূজা বিশেষভাবে করা হচ্ছে তার সংকল্প করতে হয়। তারপর তাঁর ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের মন্ত্র আছে। বিশেষ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। লক্ষ্মীর স্তোত্রও আছে। বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করার সময় এই স্তোত্র পাঠ করতে হয়। সবশেষে ত্রুটি ঘটে থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় এবং প্রণাম করে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

## লক্ষ্মীদেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।

যা গতিস্তং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াদ্বদর্চনাং।

সরলার্থ : তুমি সকল দেবতাকে বর দিয়ে থাক, ধন-সম্পদ দিয়ে থাক। আমি তোমার শরণ নিলাম। আমাকে বর দাও। আমার যেন ধন সম্পদ লাভ হয়।

## লক্ষ্মীদেবীর প্রণাম মন্ত্র

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোহস্তু তে।

সরলার্থ : হে দেবী কল্যাণী, তুমি সকলকে শুভ ফল দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করছি। আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা কর মা।

লক্ষ্মী পূজার নিষেধ হল ঘন্টাবাদ্য। লক্ষ্মীপূজা করলে ধন-সম্পদ লাভ হয়। লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হলে দুঃখ দারিদ্র্য দূর হয় এবং পরম সুখে বসবাস করা যায়।

## সরস্বতী পূজা

### সরস্বতী বিদ্যার দেবী

সাধারণত মাঘ মাসের শুরূপক্ষমী তিথিতে তাঁর পূজা করা হয়ে থাকে। আচমন, স্মৃতিবাচন থেকে শুরু করে অন্যান্য দেবতার পূজা করার পর সরস্বতী দেবীর পূজা করতে হয়। সরস্বতী পূজার জন্যও সংকল্প ও ধ্যান করতে হয়। সংকল্প ও ধ্যানের জন্য বিশেষ মন্ত্র আছে।

## সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ সরস্বতৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গাবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা। এষ সচন্দন বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ সরস্বতৈ নমঃ।

## সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে।

সরলার্থ : হে মহাভাগ সরস্বতী, হে বিদ্যাদেবী, পদ্ম ফুলের মত তোমার চোখ। তুমি বিশ্বরূপা, হে বিশাল চক্ষুর অধিকারিণী, আমাকে বিদ্যা দাও, তোমাকে আবার প্রণাম করি।

যদি প্রতিমায় পূজা করা হয় তাহলে বিধি অনুসারে বিসর্জন দিতে হয়। এ জন্যও সুনির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। বিদ্যার জন্য আত্মসমর্পণ করাই সরস্বতী পূজার মূল কথা।

## নিত্যকর্ম

ধর্মের মূল ভগবান। কেননা তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা। আবার তিনিই সকল কিছুর মধ্যে অবস্থান করেন। ঈশ্বরকে এভাবে প্রতিপন্ন করাই বেদাদির উদ্দেশ্য। উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। পূজার দ্বারা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে হয়। এ জন্য নিয়মিত পূজা ও উপাসনা করতে হয়। একই সাথে দেহ ধারণ করার জন্য দেহকেও যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হয়। দেহকে পবিত্র রাখলে মন পবিত্র হয়। দেহ ও মন পবিত্র থাকলে শান্তভাবে জীবনযাপন ও ঈশ্বরের সাধনা করা যায়। ভক্ত বা সাধক এভাবে একটি সুন্দর দৈনন্দিন জীবন পালনের পথ অনুসরণ করেন। প্রতিদিনের কর্মসূচি ঠিক করে নেন। প্রতিদিনের কাজকেই বলা হয় নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম নিত্য অর্থাৎ প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে করতে হয়। মোট কথা প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সারাদিন ধরে এবং রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত যে কাজগুলো করতে হয় সেগুলোকে নিত্যকর্ম বলে।

প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সময় কালকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— (১) প্রাতঃ (২) পূর্বাহ্ন, (৩) মধ্যাহ্ন, (৪) অপরাহ্ন, (৫) সায়াহ্ন, (৬) রাত্রি। নিত্যকর্মকেও সমকালের এই ছয়টি বিভাগের দিকে লক্ষ্য রেখে ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা (১) প্রাতঃকৃত্য, (২) পূর্বাহ্নকৃত্য, (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য, (৪) অপরাহ্নকৃত্য, (৫) সায়াহ্নকৃত্য ও (৬) রাত্রিকৃত্য।

১। প্রাতঃকৃত্য : সূর্যোদয়ের কিছু আগে ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপরে পূর্ব বা উত্তর মুখ হয়ে বসে ঈশ্বর বা দেব দেবীদের স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করতে হয় এ জন্য ধর্মগ্রন্থে মন্ত্র বা শ্লোক রয়েছে। নিচে পাঠ করার জন্য দুটি মন্ত্র দেয়া হলঃ

- (১) ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুৱাস্তকারী  
তানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।  
গুরুশ্চ শক্রঃ শনিরাহ্নকেতুঃ  
কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥

সরলার্থ : ব্রহ্মা, মুরারি, (কৃষ্ণ), ত্রিপুরাসুরের বিনাশকারী শিব, সূর্য, চন্দ্র, বুধ, গুরু, বৃহস্পতি, শক্র, শনি, রাহু, কেতু সকলে আমার প্রভাতটিকে যেন সুন্দর করেন।

(১) পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।

পুণ্যশ্লোকো বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ ॥

সরলার্থ : রাজা নল, যুধিষ্ঠির, সীতা ও বিষ্ণু—এই চারটি পবিত্র নাম। এই পবিত্র নাম চারটি স্মরণ করলে শুভ হয়। তারপর গুরুকে স্মরণ করে ঘর থেকে বাইরে এসে পৃথিবীকে ও সূর্যকে প্রণাম করবে, প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় পিতামাতাকে প্রণাম করবে। তারপর হাত—মুখ ইত্যাদি ধুয়ে স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরবে।

২। পূর্বাহ্নকৃত্য : প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং মধ্যাহ্ন বা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল কাজ করা হয় তাই পূর্বাহ্নকৃত্য। এ সময়ে প্রার্থনা, উপাসনা ও পূজা করে দিনের অন্যান্য কাজকর্ম করতে হয়।

৩। মধ্যাহ্নকৃত্য : দুপুরের কাজ খাওয়া দাওয়া এবং বিশ্রাম। যদি দুপুরে কোনো অতিথি আসে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে খাওয়াতে হয়। কারণ শাস্ত্রে বলে অতিথি নারায়ণ, অতিথির সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

৪। অপরাহ্নকৃত্যঃ দুপুরের পর এবং সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত যে কাজ করা হয় তাকেই বলে অপরাহ্নকৃত্য। এ সময়ে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজ করবে। বিকেলে খেলাধুলা, ব্যায়াম বা ভ্রমণ করলে শরীর ভাল থাকে।

৫। সায়াহ্নকৃত্য : সায়াহ্ন মানে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকালে আবার হাত—মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তারপর ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। নিম্নোক্ত উপায়ে ঈশ্বরোপাসনা করতে হবে।

(১) দীক্ষাগুরু, পিতামাতা ও দেবদেবীগণের কাছে জগদীশ্বরের উপাসনার জন্য শক্তি ভিক্ষা করতে হবে। (সাধারণ কথায় বা গানে) (২) ঈশ্বরের গুণগান করতে হবে (স্তব বা গানে)। যেমন :

দীননাথ দীনবন্ধু দীনের শরণ  
অগতির গতি পিতা অধম-তারণ॥  
দয়াময় কৃপাময় করুণানিধান  
তুমি সত্য-সনাতন পতিত-পাবন॥  
তুমি হে মঞ্জলময় শান্তি-নিকেতন  
তুমি শিব তুমি বিভু তুমি হে তারণ ॥  
অনাদি অনন্ত তুমি নিখিল কারণ  
অনন্ত জ্ঞান-নিধান হৃদয়-রঞ্জন  
সৃজন-পালনকারী কৃপার নিধান  
অনন্ত ন্যায়ের ধাম পাপীর শাসন  
মঞ্জল চরণে তব নমি হে তারণ  
মঞ্জল চরণে নমি অনাদি কারণ॥

(মহাত্মা গুরুনাথ সেনগুপ্ত)

(৩) ঈশ্বরের নিকট মৌখিক প্রার্থনা :

- (ক) পাপমুক্তির জন্য
- (খ) ভক্তি, প্রেম, একাগ্রতা ইত্যাদি যে কোনো গুণের জন্য
- (গ) জগতের কল্যাণের জন্য/শান্তির জন্য

(৪) জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান (সাধারণ কথায় বা গানে):

গান যথা :

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।  
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥  
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,  
বঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥  
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছে আমার নয়ন লোভন-  
নদী গিরিবন সরস শোভন, তুমি ধন্য ধন্য হে।  
হৃদয়ে-বাহিরে, স্বদেশে-বিদেশে যুগে যুগান্তরে নিমেষে নিমেষে  
জনমে-মরণে শোকে আনন্দে তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৫) নিম্নোক্ত কথা উচ্চারণ করে ঈশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করতে হবে।

যিনি সৃষ্টি করেছেন ভূত-সমুদয়  
সে সবারে যেই জন পালেন সদয়  
সর্বশক্তিমান যিনি জগতের পতি  
তঁাহার চরণে আমি জানাই প্রণতি ॥

(৬) রাত্রিকৃত্য : সম্প্রার পর থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সময়কালের কাজকে রাত্রিকৃত্য বলা হয়। এ সময়ে অধ্যয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়। রাতের আহাৰ গ্রহণ করতে হয়। তারপর শান্ত হয়ে ঘুমাতে যেতে হয় এবং ভগবানের এক নাম ‘পদ্মনাভ’ বলে শূয়ে পড়তে হয়।

এভাবে নিত্যকর্ম করলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। সময়ের কাজ সময়ে শেষ হয়, কোনো কাজই একেবারে অসমাপ্ত পড়ে থাকে না। নিয়মিত ব্যায়াম ও ভ্রমণে এবং আহাৰ গ্রহণে শরীর ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকলে মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে পরিবেশকে ভালো লাগে এবং সকল কাজে ধৈর্যের সাথে মনোনিবেশ করা যায়। মানুষের প্রতি প্রীতি জন্মে। নিয়মিত উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি গভীর হয়। এগুলোই হল নিত্যকর্মের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা। সুতরাং প্রাতঃকৃত্য থেকে রাত্রিকৃত্যের নিয়মাবলি আমরা মেনে চলব এবং নিজের কাজে নিষ্ঠাবান থাকব। আমাদের হৃদয়ে থাকবে সুগভীর ঈশ্বর ভক্তি।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. উপচার কয় প্রকার?

ক. এক

খ. দুই

গ. তিন

ঘ. চার

২. দীপঙ্কর পূজা করার সময় কোন দেবতার পূজা করবে?

ক. শিব

খ. গণেশ

গ. বিষ্ণু

ঘ. কার্তিক

নিচের বাক্যটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শিব প্রতিদিন সকালে গভীরভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকে।

৩. শিব ধ্যানে বসে কী চিন্তা করে?

ক. দেবতার রূপ

খ. নৈবদ্য

গ. পূজার উপচারের

ঘ. ঈশ্বরের সৃষ্টির

৪. শিব পূজায় বসে ধ্যান করে কেন?

i. একাগ্রতা আনয়নের জন্য

ii. পূজার নিয়ম মেনে চলার জন্য

iii. ধ্যানের মন্ত্র পাঠ করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

৫. পূজা মানে—

- ক. আরাধনা  
গ. সংকীর্তন

- খ. মূর্তি তৈরি  
ঘ. সেবা

৬. পূজার সময় করতে হয়—

- ক. প্রাণায়াম  
গ. সংকীর্তন

- খ. শবাসন  
ঘ. বাদ্যবাজনা

৭. ধ্যান মানে—

- ক. দেবতাদের কাছে যাওয়া  
গ. দেবতার কাছে অঞ্জলি দেওয়া

- খ. দেবতার রূপচিন্তা  
ঘ. দেবতাকে প্রণাম করা

৮. কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা কখন করা হয়?

- ক. আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে  
গ. মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে

- খ. ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে  
ঘ. চৈত্রমাসের নবমী তিথিতে

৯. হিন্দুরা কোন দেবতাকে স্মরণ করে রাতে ঘুমাতে যায়?

- ক. বিষ্ণু  
গ. দুর্গা

- খ. ব্রহ্মা  
ঘ. পদ্মনাভ

১০. প্রতিদিনের কাজকে কী বলা হয়?

- ক. নৈমিত্তিক কর্ম  
গ. গার্হস্থ্য কর্ম

- খ. নিত্যকর্ম  
ঘ. দেবকর্ম

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. দিয়া দিশাদের বাড়িতে গিয়ে দেখল, সেখানে উৎসবের আয়োজন। সে তার বন্ধু দিশাকে জিজ্ঞাসা করল, “তোমাদের বাড়িতে কীসের আয়োজন যে এতলোক সমাগম!” দিশা বলল, “আজ আশ্বিন মাস শূক্লা পক্ষের পূর্ণিমা তিথি, পূজার আয়োজন চলছে। আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন পূজায় আমরা বিভিন্ন উপচার ব্যবহার করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করি। দিয়া বলল, “আসলে কী পূজার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? আমরা জানি ঈশ্বর নিরাকার তবে কেন দেবতার প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করি?”

ক. পূজা শব্দটির অর্থ কী?

খ. সরস্বতী পূজা ও লক্ষ্মী পূজার মধ্যকার দুটি পার্থক্য চিহ্নিত কর।

গ. তোমার বাড়িতে সরস্বতী পূজার সময় কী কী উপচার ব্যবহার করে কীভাবে দেবীর পূজা করা হয় বর্ণনা কর।

ঘ. ‘পূজার ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের সাকার রূপটি প্রতিফলিত হয়।’— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।



## সম্ভব অধ্যায়

# নীতিজ্ঞান

নীতিজ্ঞান বা নৈতিকতা বলতে নীতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা আচার ব্যবহার বোঝায়। নীতি কাকে বলে? নীতি হল সমাজের জন্য, মানুষের জন্য হিতকর বা কল্যাণকর বিধিবিধান। কথাটাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলি।

যদু আর মধু দু বন্ধু। একই ক্লাসে পড়ে। একদিন যদু এমনি এমনি কোন কারণ ছাড়াই মধুকে মারল। মধুর গায়েও জোর কম ছিল না। সেও যদুকে আচ্ছা করে দু-ঘা লাগিয়ে দিল। আহত হল দুজনই। মাস্টার মশাই দুজনকেই বকলেন। ওদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেল।

### আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি

ভুজঙ্গ আর নকুলের মধ্যেও খুব বন্ধুত্ব ছিল। একদিন ভুজঙ্গ নকুলকে অযথা এক ঘুষি লাগাল। নকুল কিছু করেনি। নকুল ছিল রোগা পটকা। সে মাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করল। মাস্টার মশাই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ভুজঙ্গকে দিলেন খুব উত্তম মধ্যম। বাড়িতে নকুলের বড়দা সে কথা শুনে ক্ষেপে গেল। সেও ভুজঙ্গকে ধরে দু-ঘা বসিয়ে দিল। তা শুনে ভুজঙ্গের ছোট কাকা রেগে গেল। রাস্তায় বাগে পেয়ে সে নকুলের দাদার নাকে এক ঘুষি লাগিয়ে দিল। লেগে গেল দুই পরিবারের ঝগড়া মারামারি। দেখলে তো, সামান্য একটু মারামারির ঘটনা থেকে কত বড় ঘটনা ঘটে গেল।

এ দুটি উদাহরণ থেকে আমরা কি বুঝলাম? বুঝলাম, কাউকে অন্যায়ভাবে মারা উচিত নয়। তা অশান্তি এবং ক্ষতির কারণ হয়। এই যে কোন কাজটা করলে ভাল হবে, কোনটা করলে মন্দ হবে, তা বিচার করার যে জ্ঞান তাকেই বলে নীতিজ্ঞান বা নৈতিকতা।

নীতি শিক্ষার সাথে ধর্ম শিক্ষার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—

বেদঃ স্মৃতিঃসদাচারঃ  
স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।  
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ  
সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্।।

এর অর্থ হচ্ছে বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণী এই চারটি ধর্মের লক্ষণ।

বেদ ঈশ্বরের বাণী। স্মৃতি এক ধরনের ধর্মশাস্ত্র, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধানের বই। সদাচার মহাপুরুষদের আচরণ বা উপদেশ। স্মৃতিশাস্ত্র থেকে উপদেশ না পেলে সদাচারের ওপর নির্ভর করতে হয়। বেদ, স্মৃতি, সদাচার ছাড়াও অনেক সময় নিজেই ঠিক করে নিতে হয় কোনটা করব, কোনটা করব না। একেই বলে বিবেকের বাণী। উক্ত বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও বিবেকের বাণীর মধ্যে নীতিজ্ঞানেরও পরিচয় রয়েছে। ধর্ম বলে, জীব ঈশ্বরের অংশ, জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করবে। নৈতিকতাও জীবকে সেবা করতে বলে। নৈতিকতা বলে চুরি করবে না, হিংসা করবে না, সৎযমী হবে, সহনশীল হবে। ধর্মও একই কথা বলে। এগুলো ধর্মীয় বিধানও বটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নীতিশিক্ষা ধর্ম শিক্ষার অঙ্গ। আমরা এখন নৈতিকতার কয়েকটি বিষয় ‘সৎযম’ ‘সহনশীলতা’ ও মাদকাসক্তি নিয়ে আলোচনা করব।

## সংযম ও সহনশীলতা

সংযম কথাটির অর্থ হল নিয়ন্ত্রণ করা বা দমন করা। কাকে নিয়ন্ত্রণ করব বা দমন করব? আমার ভেতরে যে মন্দ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিগুলো আছে, সেগুলোকে। ধর্মের স্বরূপ বা বাহ্য লক্ষণের মধ্যে সংযম অন্যতম। নিজের দেহ ও মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে বা শাসনে রাখার নাম সংযম। হিংসা না করা, লোভ না করা, পবিত্রতা রক্ষা করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া এবং বৃথা দান গ্রহণ না করা সংযমের লক্ষণ। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে প্রথমে সংযম হতে হবে। সংযম হতেই ক্রমশ আসবে বিনয়ের ভাব আর তার থেকে জন্ম নেবে ঈশ্বরভক্তি।

সহনশীলতা বা সহিষ্ণুতাও ধর্মের লক্ষণ। অপ্রীতিকর অবস্থা ও আচরণের সম্মুখীন হয়েও নিজেকে সংযত রাখার যে গুণ বা শক্তি তাকে সহনশীলতা বলে। ধৈর্য, ক্ষমা, অক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা সহনশীলতা গড়ে ওঠে।

সুস্থ এবং আদর্শবান মানুষ হওয়ার জন্যে সংযম ও সহনশীলতার প্রয়োজন। সংযম ও সহনশীলতার অভাবে অনেক ভালো গুণ থাকলেও বিপথগামী হওয়ার, ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংযম ও সহনশীলতা না থাকলে অল্পতেই উদ্বেজনা আসে। উদ্বেজনা থেকে আসে লোভ, হিংসা, ক্রোধ, ঘৃণা। তখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ফলে আমরা ধর্মের পথ থেকে সরে যাই। সুতরাং ধর্মাচরণে সংযম ও সহনশীলতা অপরিহার্য। বিদ্যালাভ করতে হলেও সংযম ও সহনশীলতার প্রয়োজন। পরিমিত আহার, অধ্যবসায়, নিয়মিত অধ্যয়ন প্রভৃতি থেকে পরোক্ষভাবে এবং শিক্ষক, পিতামাতা ও গুরুজনদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা প্রভৃতি থেকে প্রত্যক্ষভাবে সহনশীলতা জন্মে। আবার সহপাঠীদের প্রতি ভালো আচরণ করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য এবং এ গুণ না থাকলে বিদ্যার্জন হয় না। সুতরাং নৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে সুন্দর জীবন লাভের জন্যে সংযমী ও সহনশীল হতে হবে।

সংযম ও সহনশীলতা সম্পর্কে একটি গল্প বলছি, শোনঃ

### প্রভু নিত্যানন্দের সহনশীলতা 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ'

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা উঠলেই শ্রীনিত্যানন্দের কথা চলে আসে। শ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম গৌরাজ্ঞ। খুব ফর্সা ছিলেন তো, তাই। আর নিত্যানন্দ থেকে নিতাই। লোকে আদর করে বলে গৌর –নিতাই।

পাঁচশ বছর আগের কথা বলছি। সে সময়ে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, মানুষে মানুষে নানা পার্থক্য আমাদের সমাজকে কলুষিত করেছিল। অহিংসার পরিবর্তে হিংসা, ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা, এমনি আরও অনেক পাপাচারে লিপ্ত হত অনেকে। এই সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তিনি বললেন কৃষ্ণ নাম কর। পবিত্র হও। পবিত্র হুদয়ে মানুষকে ভালোবাস। ভুলে যাও সব ভেদাভেদ। প্রচলিত সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের সংস্কার করে প্রচারিত এ ধর্মমতের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। আর এ কাজে শ্রীচৈতন্যের সহচর ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ।

শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ তখন থাকতেন নবদ্বীপে। সেই নবদ্বীপে তখন ছিল দু দুর্বৃত্ত। জগাই আর মাধাই। ব্রাহ্মণ বংশে তাদের জন্ম। তাই উঁচু বর্ণের অহংকার ছিল। চাকরি করত কোটালের। ধন সম্পদও কম ছিল না। জনগণের ওপর তারা নানারকম অত্যাচার করত। মুখে যা আসে তাই বলত। তাদের কথা মতো কাজ না করলে ধরে মারত। বাড়িঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিত।

একদিন জগাই মাধাই রাস্তায় হল্পা করছিল। ভয়ে ধারে কাছে কেউ ছিল না। কেউ কেউ নিরাপদ দূরত্বে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে মজা দেখছিল। শ্রী নিত্যানন্দ এগিয়ে গেলেন। সাহস তারও কম ছিল না। ছোটবেলায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন গজ্জার জলে। গজ্জায় তখন কুমিরের ভয় ছিল। তিনি সাঁতরে কুমির ধরতে যেতেন। তীরে দাঁড়িয়ে সবাই হায় হায় করে উঠত। অন্যদিকে তাঁর মন ছিল ফুলের মতো কোমল। তিনি নাচতে পারতেন, গাইতে পারতেন। তিনি গেয়ে উঠলেন।

**‘বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।’**

জগাই মাধাইকে বললেন, ওরে তোরা কৃষ্ণনাম গান কর। মানুষের জন্য ভালোবাসার প্রদীপটা বুকের ভেতর জ্বালিয়ে নে। গর্জে উঠল দুই ভাই। তেড়ে এল শ্রী নিত্যানন্দ আর শ্রীহরিদাসের দিকে। সেদিন দৌড়ে চলে গেলেন তাঁরা। ভাবখানা এমন যেন কত ভয় পেয়েছেন। ধৈর্য হারালেন না তাঁরা। নিজেদের সখ্যত করে চলে এলেন। পরে সারাদিন নগর কীর্তন করে রাতের বেলা ফিরে আসছেন। পথে দেখা হল জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে। আবার তিনি তাদের কৃষ্ণনাম করতে বললেন। একবার তাড়া খেয়েও ধৈর্য হারাননি। পাল্টা আক্রমণও করেননি। এমনই ছিল নিত্যানন্দের সংঘম। জগাই মাধাই তো রেগে আগুন। সামনে ছিল একটি মুটকী। মুটকী চিনলে তো? মাটির এক ধরনের পাত্র। মাধাই সেই মুটকী তুলে শ্রীনিত্যানন্দের মাথায় আঘাত করল। মাথা কেটে রক্ত ঝড়তে লাগল। মাধাই আবার মারতে উঠল। জগাই তাকে থামাল।

লোকজন খবর দিল শ্রীচৈতন্যকে। তিনি সাজোপাজো সঙ্গে করে ছুটে এলেন। নিত্যানন্দের রক্ত দেখে শ্রীচৈতন্যও উদ্বেজিত হয়ে উঠলেন। শ্রীনিত্যানন্দ তখন সেই রক্তাক্ত অবস্থায় নিজের কথা ভুলে গিয়ে থামালেন শ্রীচৈতন্যকে। বললেন মাধাই মারলেও জগাই তাকে থামিয়েছে। শ্রীচৈতন্য জানালেন যে জগাইকে না হয় ক্ষমা করা গেল। কিন্তু মাধাই? নিত্যানন্দের দেহ থেকে নয়, যেন আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরেছে। মাধাইয়ের নিস্তার নেই। আসলে শ্রীচৈতন্য ভগবানের অবতার, এও তার এক লীলা। তাই তিনি একটু কঠোর হলেন।

কিন্তু নিত্যানন্দ বৃষ্ণের চেয়েও সহনশীলতা দেখালেন। তিনি সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ তো নিলেনই না, বরং মাধাইকে ক্ষমা করে দিলেন, বুক জড়িয়ে ধরলেন ভাই বলে। একেই বলে সহনশীলতা। আর এর ফলে জগাই মাধাই ভালো হয়ে গেল। তারাও অনুসরণ করল বৈষ্ণব ধর্মের আলোকোজ্জ্বল পথ।

**সংঘম ও সহনশীলতা ধর্মের অঙ্গ।**

## ধূমপান ও মাদকাসক্তি

ধূমপান একটি ক্ষতিকর বদ অভ্যাস। ধূমপানের ফলে ধূমপায়ী ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়। এছাড়া ধূমপানের সময় ধূমপায়ী ব্যক্তির আশে পাশে থাকা সকলের ক্ষতি হতে পারে।

ধূমপান বলতে বোঝায় বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, তামাক ইত্যাদির ধোঁয়া পান। ধূমপানকে ডাক্তারগণ বিষপান হিসাবে অভিহিত করেছেন। বিড়ি, সিগারেট, তামাক, চুরুটের ধোঁয়ায় নিকোটিন জাতীয় পদার্থ থাকে। এই পদার্থ বিষ। ধূমপান করলে এই বিষ ধীরে ধীরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ডাক্তারগণ বলেন যে, ধূমপানের ফলে মানবদেহে নানা রকম রোগ হতে পারে। ধূমপানের ফলে কোনো ব্যক্তি যে কোনো রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। ধূমপানের ফলে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যানসার, গ্যাসট্রিক, আলসার, ক্ষুধামন্দা ও হৃদরোগ হতে পারে। এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে ধূমপায়ী ব্যক্তির অকাল মৃত্যুও হতে পারে।

ধূমপানে যে ধূমপায়ী ব্যক্তি শুধু নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, ধূমপানের সময় তার সংস্পর্শে আসা নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধূমপান এক ধরনের নেশা। যারা সখ্যমী, যারা সহনশীল তারা কোনো নেশা করেন না, তাঁরা সাধারণত ধূমপানও করেন না। আমরা ও সখ্যমী হব এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকব।

মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক বদভ্যাস। মাদক বলতে সে সব দ্রব্যকে বোঝায়, যা মানুষের দেহ ও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আসক্ত অবস্থায় মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ পায়।

মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে মদ, তাড়ি, গাঁজা জাতীয় জিনিস যেমন, চরস, ভাং, মারিজুয়ানা। আফিম জাতীয় দ্রব্য যেমন, হেরোইন, মরফিন, প্যাথেড্রিন, কোডিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ঘূমের ঔষধও মাদক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা বা এর দ্বারা নেশা সৃষ্টি হওয়া বোঝায়। যে কোনো দ্রব্য যা নেশা সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিষ্ক বিকৃত করে এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি লোপ করে তাই মাদকদ্রব্য।

হিন্দুধর্ম অনুসারে যে কোনো ধরনের নেশা বা আসক্তিই পাপ, অন্যায ও বর্জনীয়। সুতরাং এদিক দিয়ে মাদকাসক্তিও পাপ, অন্যায এবং বর্জনীয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি নানান রকম রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এগুলো হল খাদ্যে অরুচি, শারীরিক শীর্ণতা, অপুষ্টি, ওজন কমে যাওয়া, কফ, কাশি, শ্বাসনালীর ক্ষতি, গিভার ও কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তি অকালে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

ধর্মকর্মের দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও ধূমপান করা অনুচিত, মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা অন্যায। শাস্ত্রে বলে, ‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্’ অর্থাৎ ধর্ম সাধনার প্রথম শর্ত হচ্ছে শরীরকে সুস্থ রাখা। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও ভালো থাকে না। মনের স্থিরতা না থাকলে ঈশ্বরের আরাধনা হয় না। তাই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ হচ্ছে, সখ্যম অনুশীলন করে দেহ ও মনকে সাধনার উপযোগী রাখা। দেহকে অবলম্বন করে সাধনা করতে হয়। কাজেই এ দেহ যন্ত্রটি যাতে মাদক প্রভাবে কোনোরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে সেদিক বিবেচনা করে ‘সুরাপান’ কে শাস্ত্রে মহাপাপ বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, নেশায়ুক্ত জিনিস কোনো সাধকই গ্রহণ করবেন না। সুতরাং ধর্মকর্মের দিক থেকে সুরাপান বা যে কোনো মাদকাসক্তি বা নেশা বর্জনীয়। নেশা উৎপাদক ধূমপানও বর্জনীয়। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষা ও ধর্মাচরণ উভয় দিক বিবেচনা করেই ধূমপান ও মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। সুতরাং বলতে পারি যে, আমরা সখ্যমী হব। নিজেরা ধূমপান করব না, কোনো মাদকদ্রব্য গ্রহণ করব না বা কোনো প্রকার নেশা করব না। যারা ধূমপান করেন বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন তাদের ধূমপান ও মাদক দ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকতে সহায়তা করব

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সংঘম কথাটির অর্থ হলো—

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| ক. ভালো করা  | খ. নষ্ট করা       |
| গ. বর্জন করা | ঘ. নিয়ন্ত্রণ করা |

২. নীতিজ্ঞান মানুষের জন্য—

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ক. হিতকর      | খ. কষ্ট কর    |
| গ. ক্লান্তিকর | ঘ. আনন্দদায়ক |

৩. মাদকাসক্তি বলতে বোঝায়—

- মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হওয়া
- মাদকাসক্তি গ্রহণ
- মাদক দ্রব্য তৈরি ও বিক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৪. কীভাবে মাদকাসক্তির প্রতিকার করা যায়?

- মাদক বিরোধী আইন প্রণয়ন করে
- খেলাধুলা ও চিন্তাবিনোদনের ব্যবস্থা করে
- মাদক নিরাময় হাসপাতাল তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৫. মাদক জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে কী করতে হবে?

- সৎসঙ্গে বসবাস করতে হবে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরকে ত্যাগ করতে হবে।
- লেখাপড়া ঠিক সময়মতো করতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

রউফ, জয় ও জন তিন বন্ধু ঈদ, পূজা, বড়দিনের আনন্দ সমানভাবে ভোগ করে। কখনও তারা ধর্মীয় বিষয়ে পরস্পরের প্রতি আঘাত করে না।

৬. ঘটনাটিতে তিনবন্ধুর আচরণে কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে—

- |              |               |
|--------------|---------------|
| ক. সহনশীলতার | খ. সংযমের     |
| গ. নিষ্ঠার   | ঘ. বন্ধুত্বের |

৭. উক্ত বৈশিষ্ট্য মানুষকে—

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| ক. সহনশীল হতে শেখায় | খ. উদার হতে শেখায়    |
| গ. মহানুভব করে তোলে  | ঘ. আবেগপ্রবণ করে তোলে |

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

১. বন্ধুদের সজ্ঞাদোষে দীপু ধূমপানে আসক্ত হয়ে নানারকম শারীরিক সমস্যায় ভুগতে থাকে। ডাক্তার ধূমপান ত্যাগ করতে বললেও দীপু তা পারে না। এ অবস্থায় একদিন দীপুর বাবা ধূমপানের কুফল এবং করণীয় বিষয়ে ছেলেকে উপদেশ দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বললেন, ‘ধূমপান মানে বিষ পান’ একথা শুনে দীপু ধীরে ধীরে ধূমপান ত্যাগ করে।

- ধূমপান বলতে কী বোঝ?
- ধূমপানের ফলে দীপুর কী কী শারীরিক ক্ষতি হয়েছে?
- ধূমপান দীপুর পরিবারের উপর কী কী প্রভাব ফেলেছিল?
- “ধূমপান মানে বিষ পান”—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

২. ডেভিড, সুনীল ও রহমত তিন বন্ধু। তারা পরস্পরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ নানা পারিবারিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। কখনও কোনো বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয় না। তারা জানে সংযম ও সহনশীলতা ধর্মের অঙ্গ। ধৈর্য, ক্ষমা, অক্রোধ দ্বারা এ সহনশীলতা গড়ে উঠে।

- সংযম কী?
- তিন বন্ধু সহনশীলতার মাধ্যমে কাজ করে কেন?
- সংযম ও সহনশীলতা প্রয়োজন এমন কয়েকটি কাজ নির্বাচন কর এবং এসব কাজে কেন সংযম ও সহনশীলতার প্রয়োজন লেখ।
- ‘ধৈর্য, ক্ষমা ও অক্রোধ দ্বারা সহনশীলতা গড়ে ওঠে’—কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

## অষ্টম অধ্যায়

# ধর্মধর্ম

‘ধর্ম’ শব্দটির অর্থ ধারণ করা। যা কিছু ধারণশক্তিসম্পন্ন তারই নাম ধর্ম। যেমন জলের ধর্ম শীতলতা, আগুনের ধর্ম উত্তাপ ও আলো ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের যা ধারণ করে তাই আমাদের ধর্ম। যার দ্বারা উন্নতি ও মঙ্গল লাভ হয় তাকে ধর্ম বলে। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ধর্মও ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাই ঈশ্বর ধর্মের মূল।

বিশেষ বিশ্বাস এবং মঙ্গলকর আচার অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে জীবন-যাপনের যে নীতি ও পদ্ধতি এক কথায় তাকেই ধর্ম বলে।

আমরা জানি, বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং বিবেকের বাণী এই চারটি ধর্মের লক্ষণ। এও জানি, বেদ ঈশ্বরের বাণী। স্মৃতিশাস্ত্র হচ্ছে জীবন-যাপনের কিছু বিধিবিধান। মহাপুরুষদের আচরণ হচ্ছে সদাচার। নিজের নীতি জ্ঞান বা নৈতিকতাকে বলে বিবেকের বাণী। এই চারটি অনুসরণ করে ধর্মধর্ম নির্ণয় করা হয়।

ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় ধার্মিকের মধ্যে। ধার্মিকের মধ্যে কয়টি বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা কয়েকটি বিশেষ গুণ যার মধ্যে রয়েছে, তাঁকে ধার্মিক বলা হয়। এরকম দশটি গুণের মধ্যে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়।

ধৃতি-ক্ষমা-দমোৎসেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শূচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৃঙ্খলবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ-এই দশটি ধর্মের স্বরূপ বা বাহ্যলক্ষণ।

ধর্ম কি বুঝতে পারলে, অধর্ম কাকে বলে, তাও সহজে বোঝা যাবে। কারণ যা ধর্ম নয় তাই অধর্ম। যেমন সহিষ্ণুতা ধর্মের লক্ষণ, তাহলে অসহিষ্ণুতা অধর্ম। চুরি না করা ধর্মের লক্ষণ সুতরাং চুরি করা অধর্ম।

ধর্ম মানুষকে সৎ পথে রাখে, তাকে রক্ষা করে। অধর্ম মানুষকে অসৎ পথে টেনে নেয় এবং তাকে ধ্বংস করে।

ধার্মিক তার ধর্মের দ্বারা জয়লাভ করেন। অধর্মের পরাজয় ঘটে। ধর্মের জয় সম্পর্কে একটি গল্প বলছি শোন :

### ধর্মের জয়

এক দেশে এক রাজা ছিল। সেই রাজার ছিল এক পুত্র। এই রাজপুত্রের নাম হল চন্দ্রহাস। ছেলেবেলায় তাকে রাজ্য থেকে দূরে অন্য এক জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে সেই দেশের রাজার হাতে গিয়ে পড়ে। রাজার তো অনেক দাসদাসী। সে দাসদাসীদের ছেলের মতই রাজবাড়িতে মানুষ হতে লাগল। একদিন রাজবাড়িতে এক অনুষ্ঠানে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বলল, এ ছেলে ভবিষ্যৎ রাজা হবে। এ কথা শুনে রাজার খুব দুঃখ হল। রাজপুত্র থাকতে কিনা পরের ছেলে রাজা হবে। রাজা তাকে জল্পাদের হাতে দিয়ে বললেন একে বধ্য ভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে। জল্পাদ কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না। চন্দ্রহাসকে নিয়ে চলে গেল। চন্দ্রহাস খুবই ধার্মিক ছিল। সে একমনে ভগবানকে ডাকল আর বলল, “আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। আমাকে রক্ষা কর প্রভু”। ভগবান চন্দ্রহাসের ডাক শুনলেন। জল্পাদরা শিশু হত্যা করতে চাইল না। তারা চন্দ্রহাসের হাতের একটি আঙ্গুল কেটে তাকে ছেড়ে দিল। চন্দ্রহাসের এক হাতে ছটি আঙ্গুল ছিল। তা নিয়ে তার মনে খুব দুঃখ ছিল। এখন এই বাড়তি আঙ্গুল তার জন্য হল

শাপে বর। ছয় আঙ্গুল থাকলে নাকি রাজা হওয়া যেত না এমন প্রথা তখন ছিল। ভগবান এই ছলে বাড়তি আঙ্গুল কাটিয়ে নিলেন। এখন আর রাজা হওয়ার পথে বাধা থাকল না।

জল্লাদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে চন্দ্রহাস হাঁটতে হাঁটতে বনের মধ্যে এসে পড়ল। সেই বনে শিকার করতে এসেছিলেন এক রাজা। তিনি চন্দ্রহাসকে দেখতে পেয়ে তাকে নিজ রাজ্যে নিয়ে গেলেন।

এই রাজা আবার চন্দ্রহাসকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠালেন আরেক রাজার কাছে। এই রাজা হলেন তিনি যিনি চন্দ্রহাসকে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রাজা অবাক হল। রাগও হল তার। জল্লাদরা তাহলে চন্দ্রহাসকে হত্যা করেনি।

আবার বিপদে পড়ল চন্দ্রহাস। তবে এখন সে আর ছোটটি নয়, সে এক বীর সাহসী যুবক। বিপদে পড়ে সে আবার ভগবানকে ডাকতে লাগল। রাজা তখন তার ছেলের কাছে একটি চিঠি লিখে চন্দ্রহাসকে দিয়ে বললেন— এই পত্র আমার পুত্রের কাছে লিখেছি। সে এখন উপবনে অবসর যাপন করছে। চিঠিটি খুব গোপনীয়। খুলবে না। কাউকে দেখাবে না। তাকে দিয়ে আসবে।

চন্দ্রহাস বলল : আজ্ঞে মহারাজ, বুঝেছি।

পত্রে লেখা ছিল এই ব্যক্তি যখন পৌঁছবে তখন তাকে ‘বিষে সমর্পণ’ করবে। ঐ রাজার রাজকন্যার নাম ছিল বিষা। সেও তখন রাজপুত্রের কাছেই ছিল। রাজপুত্র ভাবলেন বিষে মানে তার বোন বিষাকে সমর্পণ করবে। ঠিক আছে, করব। চন্দ্রহাসের সাথে বিয়ে হল রাজকন্যার।

রাজপুত্র আনন্দের সঙ্গে চন্দ্রহাস আর বিষাকে নিয়ে রাজপুরীতে উপস্থিত হলেন। শূনে তো রাজা অবাক। রাগও হল খুব। কাউকে কিছু বলতেও পারছেন না।

রাজা হাল ছাড়লেন না। মেয়ে বিধবা হয় হোক। চন্দ্রহাসকে তিনি বাঁচতে দেবেন না। তিনি কালী পূজার ছল করে চন্দ্রহাস আর বিষাকে পাঠালেন মন্দিরে। রাজার আদেশে সেখানে জল্লাদ তৈরি থাকবে। চন্দ্রহাস যখন সাক্ষাৎ প্রণাম করবে, তখন খড়্গের আঘাতে তাকে হত্যা করা হবে।

রাজার কুমতলব মন্দিরের দেবীর কাছে অগোচর রইল না। তিনি ঠিক করলেন ধার্মিক চন্দ্রহাসকে তিনি রক্ষা করবেন। চন্দ্রহাস প্রণাম করছেন। জল্লাদ তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত। ঠিক এ সময়ে মন্দিরের দেবী প্রতিমা দুভাগ হয়ে গেল। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন দেবী কালী। তারপর খড়্গ দিয়ে চন্দ্রহাসের শত্রুদের কেটে ফেললেন। বার বার চেষ্টা করার পরেও রাজা ধার্মিক চন্দ্রহাসকে হত্যা করতে পারলেন না। রাজা শোকে দুঃখে মন্দিরের সামনে আত্মহত্যা করলেন।

চন্দ্রহাস রাজা হলেন। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্মের জয় হয়। অধর্মের ঘাটে পরাজয়।

## অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. জল্লাদরা কী করতে চাইল না—

ক. রাজা হত্যা

গ. আত্মহত্যা

খ. শিশু হত্যা

ঘ. সন্ন্যাসী হত্যা



২. অধর্ম মানুষকে ধ্বংস করে, কথাটির সাথে মিল রয়েছে—

- i. অসৎ পথে টেনে নেওয়া
- ii. অসহিষ্ণু হওয়া
- iii. কুকর্মে ব্রতী হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. রাজা চন্দ্রহাসের হাতে একটি চিঠি দিয়েছিলেন কেন?

- i. বিব প্রয়োগে মৃত্যু ঘটানোর জন্য
- ii. বিবাহের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য
- iii. মেয়েকে দিয়ে চন্দ্রহাসের মৃত্যু ঘটানোর জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. ii          |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. কাকে ছেলেবেলাতেই রাজ্য থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো?

- |                |               |
|----------------|---------------|
| ক. চন্দ্রহাসকে | খ. রাজ হাঁসকে |
| গ. বিভাসকে     | ঘ. সুহাসকে    |

৫. শুভেচ্ছা বড় হয়ে সৎ পথে উপার্জন করে সৎ জীবন যাপন করতে চায়। তার এ সৎ জীবনের পিছনে রয়েছে—

- |              |         |
|--------------|---------|
| ক. কর্ম      | খ. ধর্ম |
| গ. আচার বিধি | ঘ. নীতি |

**সৃজনশীল প্রশ্ন :**

১. সদিস্খা ধর্মানুষ্ঠানে গিয়ে বিভিন্ন ধার্মিকের বক্তব্য শুনে বুঝল ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। সে ধর্ম ও অধর্ম সম্পর্কে একটি সুন্দর ধারণা পেলো। ভালো কাজ করলে পুণ্য হয় এবং খারাপ কাজ করলে পাপ হয়। ধর্ম মানুষকে সৎপথে রাখে। বিভিন্ন ধর্মীয় গল্পের মাধ্যমে সদিস্খা বুঝল যে, ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

- ক. ধর্ম কী?
- খ. সদিস্খা কীভাবে বুঝল ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে?
- গ. কয়েকটি ধর্ম ও ধর্মের কাজ চিহ্নিত কর এবং কেন তা ধর্ম বা অধর্ম ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী’—উক্তিটির গুরুত্ব ধর্মীয় কাহিনীর আলোকে লেখ।

## নবম অধ্যায়

# উপাখ্যান

### ভক্ত বালকের ঈশ্বর সাধনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ।” তবে ঈশ্বর লাভ করতে হলে মানুষকে সাধনা করতে হয়। সাধনার কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সের লোক ঈশ্বর সাধনা করতে পারেন। ধ্রুব বাল্যবয়সে ঈশ্বর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনার কাহিনী পুরাণে উপাখ্যান হয়ে রয়েছে।

পুরাকালে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল দুই স্ত্রী—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতি বড়, সুরুচি ছোট। সুরুচি ছিল রাজার খুব প্রিয়। দিন যায়, কালক্রমে সুনীতির ধ্রুব ও সুরুচির উত্তম নামে দুই পুত্র হয়। সুরুচির পুত্র বলে উত্তমই রাজার আদর পেত। কিন্তু ধ্রুব পিতার আদর থেকে হয় বঞ্চিত।

একদিন রাজা উত্তমকে কোলে নিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় ধ্রুব সেখানে এসে উপস্থিত। তারও ইচ্ছা হয় বাবার কোলে ওঠার। সে বাবার কোলে উঠতে গেল, তখন সুরুচি এসে বাধা দিলেন। ধ্রুবকে বললেন, “সুনীতির গর্ভে জন্মেছ, আবার বাবার কোলে উঠতে চাও। যদি সত্যি সত্যি বাবার কোলে ওঠার সাধ থাকে, তবে ঈশ্বর আরাধনা কর। যাতে পরজন্মে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে পার। তা না হলে জীবনেও বাবার কোল পাবে না।”

বিমাতার কথা শুনে ধ্রুবর মনে বড় দুঃখ হল। কাঁদতে কাঁদতে সে মায়ের কাছে গেল। সুনীতি স্নেহভরে ছেলের কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। ধ্রুব বিমাতার কথাগুলো সব খুলে বলল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে সুনীতিও কাঁদলেন। তারপর ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—“দুঃখ করো না, বাবা। তোমার ছোটমা ঠিকই বলেছেন। মানুষের দুঃখ একমাত্র শ্রীহরীই দূর করতে পারেন। তুমি মনে প্রাণে শ্রীহরিকে ডাক। ডাকার মত ডাকতে পারলে তিনি অবশ্যই কৃপা করে থাকেন।

মায়ের কথায় বালক ধ্রুব দুঃখ জয়ের সন্ধান পেল। সে স্থির করল শ্রীহরির সাধনা করবে।

ধ্রুবের বয়স পাঁচ বছর। একদিন রাতে সবাই ঘুমিয়ে আছে; এমন সময় ধ্রুব ঘরবাড়ি, মা বাবা সবকিছু ছেড়ে রওনা হল শ্রীহরির সাধনায়। দিন নেই, রাত নেই, ধ্রুব শ্রীহরিকে ডেকে চলেছে। ক্রমে সে গহীন বনের ভেতর গিয়ে পড়ল। সে এক মনে, এক ধ্যানে শ্রীহরিকে ডেকে চলেছে। ধ্রুবের সাধনায় বনের বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুরাও তার কোনো ক্ষতি করছে না।

শ্রীহরিকে সে কোনোদিন দেখেনি, তিনি কেমন তাও জানে না; তাই যাকেই সামনে পায়, হরি মনে করে তাকেই জড়িয়ে ধরে। চলতে চলতে দেখা পেল এক সন্ন্যাসীর। হাতে বীণা, মুখে হরিনাম। ধ্রুব ভাবল, এই বুঝি তার শ্রীহরি। সে তাঁকে প্রণাম করে পরিচয় জানতে চাইল। সন্ন্যাসী নিজেকে দেবর্ষি নারদ বলে পরিচয় দিলেন। ধ্রুবকে সংসার বিরাগীর বেশে দেখে বললেন, “বাছা, তুমি অভিমান করে ঘর ছেড়েছ। কাজটি ভালো করনি। যার জন্য তুমি বনে ঘুরছ, তাঁকে কি এই বয়সে এত সহজে পাওয়া যায়? ঘরে ফিরে যাও। সংসারধর্ম কর। সুখ ভোগ কর। তারপর বয়স হলে সাধন ভজন করবে।”

উত্তরে ধ্রুব বলল, “আপনাকে প্রণাম করি, আপনি দেখছি সবই জানেন। পিতার আদর না পেয়ে আমি সংসার ছেড়েছি, সংসারের প্রতি আমার টান নেই। আমি এমন রত্ন চাই যা আমার পিতামহও কোনোদিন পাননি। শ্রীহরির কৃপা না পেয়ে আমি ঘরে ফিরে যাব না। কি করলে আমি শ্রীহরির দেখা পাব, দয়া করে আমাকে তাই বলুন, প্রভু।”

বালক ধ্রুবের কথায় দেবর্ষি নারদ খুশি হলেন। তারপর তিনি বললেন, “বৎস ধ্রুব, কালিন্দী নদীর তীরে যে মধুবন আছে সেখানে গিয়ে শ্রীহরির তপস্যা কর। তা হলেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীহরির দেখা পাবে। শান্ত মনে “শ্রীহরিনাম” মন্ত্র জপ করবে। তবেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাবে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে”।

দেবর্ষি নারদ বীণা বাজিয়ে হরিগুণগান করতে করতে চলে গেলেন।

ধ্রুব মধুবনের উদ্দেশ্যে রওনা হল। কত নদ-নদী-পর্বত প্রান্তর পার হয়ে কালিন্দী নদীর তীরে পৌঁছল। নদীতে স্নান করে মধুবনে বসে ধ্রুব শ্রীহরির আরাধনা আরম্ভ করল। দিনের পর দিন যায়। শ্রীহরির দেখা নেই। ধ্রুবও আসন ছেড়ে ওঠে না। স্নান নেই, আহার নেই, ঘুম নেই।

ধ্রুবের কঠোর সাধনায় শ্রীহরি তুষ্ট হয়ে তার সামনে উপস্থিত হলেন। সহসা চারদিক সুগন্ধে ভরে গেল। ধ্রুব তখনও চক্ষু বন্ধ করে মনে মনে শ্রীহরির রূপ ধ্যান করছিল। চক্ষু খুলে দেখল তার ধ্যানের শ্রীহরি অপরূপ রূপ ধরে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ধ্রুব ভক্তিভরে প্রণাম করল, শ্রীহরি আদর করে ধ্রুবকে কোলে তুলে নিলেন।

ধ্রুব শ্রীহরির স্তব-স্তুতি করল। সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাকে বললেন, “বৎস তুমি বালক হয়েও যে কঠোর তপস্যা করেছ, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি। জননীর পুণ্যে তোমার অন্তরে যে ভক্তি জন্মেছে, তার ফলেই তুমি আমার দেখা পেলে। এখন কী বর চাও বল, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করব।”

শ্রীহরির আদেশ পেয়ে ধ্রুব তপস্যা ছেড়ে বলল, “প্রভু, তুমি তো আমার অন্তরের সব কথাই জান আমি কি আর বলব।”

শ্রীহরি বললেন, “তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রাদিরও উপরে হবে তোমার স্থান। তোমারই নামে স্থানটির নাম হবে ধ্রুবলোক। বৈকুণ্ঠের আলোকে ধ্রুবলোক আলোকিত থাকবে। মৃত্যুর পর তুমি ঐ ধ্রুবলোকে স্থান পাবে। এবার ঘরে ফিরে যাও, তোমার কিছুকাল সংসার করতে হবে।”

এই বলে প্রসন্নচিত্তে শ্রীহরি বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। বালক ধ্রুব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে পেল পরম আনন্দ।

## ক্ষমার আদর্শ

অনুতস্ত অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়াকে ক্ষমা বলে।। ক্ষমা ধর্মের অঙ্গ। ক্ষমায় অপরাধীর অন্তর শূন্য হয়। সে পুনরায় অপরাধ করে না। ক্ষমার সাহায্যে মানুষের মহৎ গুণের প্রকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। ক্ষমার আদর্শের একটি কাহিনী তোমাদের বলছি, শোন :

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা। সত্যযুগ ত্রেতাযুগ পার হয়ে পৃথিবীতে তখন দ্বাপর যুগ চলছে। দৈত্য কংস তখন মথুরার রাজা। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ মথুরা। বিষ্ণুভক্তদের সে অত্যন্ত কষ্ট দিত। শুধু কংস একা নয় জরাসন্ধ, শিশুপাল এবং এ রকম আরও অনেক রাজা খুব অত্যাচারী ছিল। এসকল দুষ্কে দমন করে, ধর্ম রক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের তখন বাল্যকাল। সে সময়ে কালিন্দী নদীর মধ্যে একটি হ্রদ ছিল, সেই হ্রদে বাস করত এক বিষধর সাপ। নাম তার কালীয় নাগ। কালীয় নাগের চেহারা ছিল ভয়ংকর। এক হাজার মাথা ছিল তার। এক হাজার মুখ থেকে ধক-ধক করে আগুন বেরুত, আগুনের সাথে ধোঁয়া। তাই কালীয় হ্রদের তীরে কেউ থাকতে পারত না। জনশূন্য হয়ে পড়ে কালিন্দীর তীর। কালিন্দীর জল কালীয় নাগের মুখ থেকে বেরুনো আগুনে গরম হয়ে সবসময় টগবগ করে ফুটত। সেখানকার জলও ছিল বিষাক্ত। কালিন্দীর সেই জলে কেউ যদি নামত বা সেই জল কেউ যদি পান করত তাহলে তৎক্ষণাৎ মারা যেত। কালীয় আবার ফোয়ারার মত উঁচু করে জল ছুঁড়ে দিত আকাশে। সেই বিষাক্ত জলকণা বাতাসকেও বিষাক্ত করে তুলত। সেই বাতাস যদি কোনো উদ্ভূত পাখিকে স্পর্শ করত, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ হ্রদের ভেতরে পড়ে মারা যেত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম, সুদাম, সুবল, শ্রীদাম এবং আরও সখাদের নিয়ে কালিন্দীর তীরে গেছেন ধেনু চরাতে। পৃথিবীপালক ভগবান পৃথিবীতে নেমে এসে শ্রীকৃষ্ণরূপে হয়েছেন ব্রজের রাখাল। একদিন শ্রীকৃষ্ণের সখা রাখাল বালকেরা ধেনু চরাতে চরাতে এসে পড়ে কালিন্দীর তীরে। দারুণ পিপাসায় শ্রীকৃষ্ণের সখারা আর তাদের ধেনুগুলো পান করে কালিন্দীর জল। আর যায় কোথায়। শুরু হয়ে যায় বিষের যন্ত্রণা। তাঁরা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ তাদের সেই দশা দেখে বুঝলেন এই কালীয় হ্রদের বিষেই এই দুর্ঘটনা ঘটল।

তিনি তখন কালীয় হ্রদের পাশের একটা উঁচু গাছে উঠলেন। সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কালীয় হ্রদের জলে। তাঁর এই পতনের বেগে কেঁপে উঠল কালিন্দী। তোড়পাড় শুরু হল সেখানে, প্রচণ্ড ঢেউ উঠল গর্জন করে। ফুলে উঠল কালিন্দীর জল, প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন হয়। জলের শব্দ শুনে কালীয় ভাবল, কে এল? আক্রমণ করবে নাকি আমার ভবন। সে তখন কালিন্দীর ভেতর থেকে ভেসে উঠল ওপরে। দেখল শ্রীকৃষ্ণকে, হাত দিয়ে জলের মধ্যে ঘূর্ণির সৃষ্টি করছেন তিনি। ‘তবে রে, আমার ভবনে এসে দুফুঁমি।

কিন্তু পীতবসনধারী বনমালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। হাসি দেখে আরও ক্ষেপে গেল কালীয় নাগ। সে তার এক হাজার ফণা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরল। তীরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা এ দৃশ্য দেখে ভয়ে আকুল হয়ে গেল। ভয় আরও বাড়ল, যখন শ্রীকৃষ্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন—এমন ভাব দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরীরকে বড় আরও বড় আরও বড় করে বিশাল করে তুললেন। কালীয় সহ্য করতে পারল না। ফণার বাঁধন আলগা হয়ে গেল। দারুণ রাগে সে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

—পালাব নাকি।’ ভাবল কালীয়।

—কোথায় পালাবে। শ্রীকৃষ্ণ তখন কালীয় নাগের মাথায় উঠে নৃত্য করতে লাগলেন। কালীয় নাগ অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। শুরু হল তাঁর রক্তবমি। প্রাণ আর বাঁচে না। কালীয় নাগ পরাজিত হল।

কালীয় বলল, আমি অনেক পাপ করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার স্ত্রী আছে। আমার সন্তান আছে। বার বার ক্ষমা চাইতে লাগল কালীয় নাগ।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তুমি যখন অন্যদের হত্যা করেছ, তাদেরও স্ত্রী ছিল, সন্তান ছিল। আর এমনি করে হত্যার উল্লাসে মেতে উঠবে? তখন আবার কালীয় বলল, আর কখনও এমন করব না। আমি প্রাণ ভিক্ষা চাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দয়া হল। তিনি কালীয়কে বললেন, তোমার প্রাণ এখন আমার হাতে। আমি এখনই তোমাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু তা করব না। কারণ তুমি ক্ষমা চেয়েছ, তোমার ভেতরে অনুশোচনা এসেছে।

— আমি অনুতপ্ত, আমি অনুতপ্ত। বলল কালীয়।

— তাই তোমাকে ক্ষমা করলাম। তুমি এই হ্রদ ছেড়ে, কালিন্দী ছেড়ে চলে যাও।

—কালীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে কালিন্দী ছেড়ে সপরিবারে চলে গেল— একেবারে সাগরে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু বীরত্বের নয়, ক্ষমারও আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। কালীয় দমনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বীরত্বের পাশাপাশি ক্ষমার সুমহান আদর্শ।

## ব্রহ্মবাদিনী গার্গী

বৈদিক যুগ, প্রাচীন যুগ। সে যুগে শিক্ষার প্রসারতা বেশি ছিল না। তবে সে সময়ে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বৈদিক মন্ত্রগুলোর মধ্যে। অনেক বৈদিক মন্ত্রের দৃষ্টা হচ্ছেন পুরুষ ঋষি, আবার বেশ কিছু বৈদিক মন্ত্র এসেছে মহিলা ঋষিদের মাধ্যমে। এদের মধ্যে ঘোষা, লোপামুদ্রা, বাক, গার্গী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সে যুগে চিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি অনেক ধরনের বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা ছিল। তবে ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলে মনে করা হত। গার্গী এই ব্রহ্মবিদ্যাতে হয়েছিলেন পারদর্শী।

গার্গীর পিতা ছিলেন একজন ঋষি। তাঁর নাম বচস্র ঋষি। ছোট সময় থেকে গার্গীর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। পিতা তাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে উৎসাহ দেন। গার্গীর সাধনা চলতে থাকে। কালক্রমে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠেন বলে তাকে বলা হয় ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এক কাহিনী রয়েছে। একবার মিথিলার রাজা জনক এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সে যজ্ঞে অনেক জ্ঞানী, গুণী, মুনি, ঋষির সমাগম ঘটে। খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন হতে যাচ্ছে। এখন দক্ষিণা দেয়ার পালা। রাজর্ষি জনক, এই সুযোগে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি কে হবেন, তা জেনে নিতে চান। ঘোষণা করেন, তিনি সহস্র গাভী দান করবেন। তবে এই যজ্ঞ সভার মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও ব্রহ্মবিদ তিনিই তাঁর সহস্র গাভী গ্রহণ করবেন।

এই ঘোষণার পর যজ্ঞ সভা যেন চুপ হয়ে গেল। কে হবেন সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি? এই নিয়ে সবাই চিন্তিত। সেই নীরবতা ভাঙ করে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ দাবি করলেন। কিন্তু এই দাবি সবাই বিনা বাক্যে মেনে নিলেন না। রাজর্ষি জনকের পুরোহিত ‘অশ্বল’ ও অন্যান্য ঋষিগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করলেন। শুরু হল যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে তাঁদের জ্ঞানের পরীক্ষা। তাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতে থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে সঠিক উত্তর পেয়ে তাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন।

এমন সময় যজ্ঞে উপস্থিত বেদজ্ঞ মহিলা ঋষি গার্গী প্রশ্ন তুললেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জর্জরিত করে তোলেন। তিনি জানতে চান পৃথিবীর জল, বায়ু ইত্যাদি কিসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গার্গীর প্রশ্ন ক্রমে

সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয়ের দিকে যেতে থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য গাঙ্গীর সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন। এরপরও গাঙ্গী থেমে যাননি। তিনি ভুলোক, দ্যুলোক ছেড়ে ব্রহ্মলোক সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী গাঙ্গীকে থামতে বলেন। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন, বেদে প্রশ্ন করার একটা সীমা নির্দেশ করা রয়েছে। একে বলা হয় বৈদিক অনুশাসন। এটা অমান্য করলে পাপ হয়। আর সে পাপে গাঙ্গীর বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা।

এরপর গাঙ্গী আর প্রশ্ন করেননি। গাঙ্গীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বলে স্বীকার করা হয়। যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনকের দান গ্রহণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য গাঙ্গী যে সকল প্রশ্ন করেন তাতে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় মেলে। সভায় উপস্থিত মুনি, ঋষিগণ গাঙ্গীকে ব্রহ্মবাদিনী বলে অভিনন্দন জানান। সেই থেকে তিনি একজন ব্রহ্মবাদিনী হিসেবে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। জ্ঞানই মানবজীবনের পরম সম্পদ। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখে যান তাঁদের কথা মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাই এতকাল পরেও বর্তমান বিজ্ঞান সভ্যতার আলোতে বসে বৈদিক যুগের অন্যতম বিদুষী নারী গাঙ্গীর অবদান স্মরণীয়।

## বুদ্ধ্যভেদে জ্ঞানভেদ

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক-এ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা হয়। তাই এ পাঁচটিকে বলা হয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। তবে কোনো কিছু দেখা বা শোনা মাত্রই কিছু কোনো বিষয়ে জ্ঞান হয় না। এর জন্য বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়। এই বিচার বিবেচনার কাজটি করে ‘বুদ্ধ্য’। আবার এই বুদ্ধ্য কিছু সবার এক রকম হয় না। যার যেমন বুদ্ধ্য তার তেমনি জ্ঞান হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপাখ্যানটি স্মরণ করা যায়।

ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্তা। বেদে ও উপনিষদে ব্রহ্মাকে প্রজাপতি বলা হয়েছে। দেবতা, মানব ও দানব এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। শুধু সৃষ্টি করাই নয় এদের শিক্ষাদীক্ষার ভারও গ্রহণ করেছিলেন প্রজাপতি নিজেই।

দেবতা, মানব ও দানব এঁরা সবাই আছেন প্রজাপতি আশ্রমে। তাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করছেন। তেজোলাভ করার জন্য ব্রহ্মচর্য প্রয়োজন; আর বিদ্যালাভের জন্য তেজের প্রয়োজন। এই কারণেই তাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করছিলেন। দীর্ঘদিন এভাবে চলে যাচ্ছে। তাঁরা প্রজাপতির উপদেশ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছেন।

দেবতাদের চরিত্র স্বভাবতই নির্মল। ব্রহ্মচর্যের গুণে মানব দানব অপেক্ষা অনেক আগেই তাঁরা লাভ করেন তেজ। আর এজন্যই দেবতারা সবার আগে প্রজাপতির কাছে গিয়ে বললেন, ‘ভগবান’ আমরা অনেক কাল ব্রহ্মচর্য পালন করেছি। এখন আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন, শুধু বললেন ‘দ’। উপদেশ দেবার পর তিনি ভাবলেন, দেবতারা তাঁর উপদেশটির অর্থ বুঝতে পারছেন কি? তাই জিজ্ঞেস করলেন, আমি যা উপদেশ দিয়েছি তা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো? দেবতারা বললেন, হ্যাঁ ভগবান, বুঝতে পেরেছি। আপনি ‘দ’ বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে “দমন কর। দমন কর।”

স্বর্গ ভোগ সুখের স্থান। দেবতারাও ছিলেন ভোগ সুখের প্রতি আসক্ত। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তাঁরা বুঝেছিলেন যে ইন্দ্রিয় দমনই চিন্তা নির্মল রাখার উপায়। তাই দেবতারা প্রজাপতির উপদেশ ‘দ’-এর অর্থ করেছেন “ইন্দ্রিয় দমন কর”।

দেবতাদের পরে মানবদের পালা। প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হয়ে তারা বললেন, “ভগবান দীর্ঘকাল ধরে আমরা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে চলছি। এখন আপনার উপদেশ পেতে চাই।” প্রজাপতি এবারও সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন ‘দ’। তারপরই জিজ্ঞেস করলেন বুঝতে পেরেছ তো, আমি কি উপদেশ দিয়েছি? মানব সন্তান বললেন, হ্যাঁ ভগবান, বুঝতে পেরেছি, ‘দ’ মানে দান কর।

মানবরা স্বভাবত সঞ্চয় করতে পছন্দ করে, এরা লোভী। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তাদের চিন্তা নির্মল হয়েছিল বলে তাঁরা বুঝতে পারলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা ‘দ’ উপদেশ করে তাদেরকে দান কর বলেছেন।

এরপর এলেন দানব সম্ভান। তাঁরাও গিয়ে প্রজাপতিকে বললেন, ভগবান দীর্ঘকাল আমরা ব্রহ্মচর্য পালন করে চলছি। এখন আমাদের উপদেশ দিন।

ব্রহ্ম এবারও বললেন, ‘দ’। তারপরই জিজ্ঞেস করলেন, বল তো, কি বলেছি? দানবরা উত্তর করলেন, ‘দ’ মানে দয়া কর। দানবরা স্বভাবতই নির্ভর। ব্রহ্মচর্য আচরণ করে তাদের চিত্ত অনেকটা নির্মল হয়েছিল, তাই তারা সহজেই বুঝতে পারল যে ব্রহ্ম তাদের দয়া করবারই উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিভেদে জ্ঞানভেদ ঘটে। ঋষিরাও বিভিন্ন শাস্ত্রে এই তিনটি উপদেশই দিয়েছেন। দম, দান এবং দয়া। দমন কর, দান কর, দয়া কর।

## অনুশীলনী

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. মানুষের দুঃখ কে দূর করতে পারে?
 

ক. দুর্গা	খ. নারায়ণ
গ. শ্রীহরি	ঘ. মহেশ্বর
২. দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে সাধনার নিয়ম-কানুন কেন বললেন?
 

ক. ধ্রুবের সাধনায় মুগ্ধ হয়ে	খ. শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীহরির দেখা পাওয়ার জন্য
গ. জননীর পুণ্যে শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য	ঘ. শ্রীহরিই তাহার অন্তর্যামী বলে
৩. স্থানটির নাম ধ্রুবলোক হওয়ার কারণ—
 

i. কালিন্দী নদীর তীরে অবস্থিত বলে	ii. অত্যন্ত নির্জন জায়গা মধুবন বলে
iii. ধ্রুবের নামানুসারে	

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ক. i   | খ. ii          |
| গ. iii | ঘ. i, ii ও iii |

### ৪. ধ্রুবের হরি ভক্তির মূলে—

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| i. বাবার অনাদর    | ii. জননীর পুণ্য |
| iii. বিমাতার বচসা |                 |

### নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. ii          |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. ঈশ্বর লাভ করতে হলে মানুষকে—

- i. তপস্যা করতে হয়
- ii. সাধনা করতে হয়
- iii. পূজা করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. ii          |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কালীয় নাগের অত্যাচারে কালীয় হ্রদের পানি বিষাক্ত হয়েছে। ফলে ঋয়ং ভগবান অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সর্বত্র বিষের যন্ত্রণা। কালীয় নাগ নিজের কর্মফলের সাজা পেল।

৬. কালীয় হ্রদের পানি বিষাক্ত হওয়ার কারণ কী?

- i. নাগের সুখ নিঃসৃত আগুনের ফল
- ii. পানিতে গাছগাছরা ও শ্যাওলা পচা
- iii. কালীয় নাগের আগুনে জল টগবগ করে ফুটত

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |                |
|-----------|----------------|
| ক. i      | খ. ii          |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৭. ঋয়ং ঈশ্বর কালীয় নাগকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করলেন কেন?

- ক. কালীয় নাগের অত্যাচারে সমগ্র জীবকুল অতিষ্ঠ হয়েছিল বলে
- খ. ঋয়ং ঈশ্বরের উপর নজরদারী করেছিল বলে
- গ. ভগবানের হাসি দেখে ক্ষেপে উঠেছিলেন বলে
- ঘ. দারুণ ফনা তুলে ফেঁস ফেঁস করে সকলকে ভয় দেখাত বলে

৮. দেবতাদের চরিত্র স্বভাবতই—

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. উজ্জ্বল | খ. নির্মল |
| গ. সুন্দর  | ঘ. পবিত্র |

৯. ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বলতে বোঝায়—

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ক. ব্রহ্মবিদ্যার সাধনা করা         | খ. ব্রহ্মজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া    |
| গ. ব্রহ্মবিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা | ঘ. ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিকালের শ্রেষ্ঠ |

১০. বুদ্ধি কিসের কাজ করে?

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ক. বিবেকের        | খ. মনের             |
| গ. বিচার বিবেচনার | ঘ. পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের |



১১. অনুতপ্ত অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়াকে বলে—

- |          |            |
|----------|------------|
| ক. ক্ষমা | খ. দয়া    |
| গ. মায়া | ঘ. ক্ষেত্র |

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের মনে নানা কষ্ট থাকে। বালক ধ্রুবের মনে এরকম অনেক কষ্ট ছিল। সে মায়ের মুখে শুনছে, মানুষের দুঃখ কষ্ট একমাত্র শ্রীহরিই দূর করতে পারেন। তাই শ্রীহরিকে পাবার জন্য ধ্রুবকে একদিন সংসার ছেড়ে চলে যেতে হলো গভীর বনে। সেখানে সে শ্রীহরির সাধনা করতে লাগল। ধ্রুবের কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাঁকে দেখা দিলেন। এতে ধ্রুবের মনে দুঃখ কষ্ট দূর হলো।

- ক. ধ্রুব কে?
- খ. ধ্রুবের মনে কষ্ট ছিল কেন?
- গ. শিক্ষা জীবনে ভালো ফলাফল লাভে ধ্রুবের হরি সাধনা তোমাকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করবে?
- ঘ. ভক্ত বালক ধ্রুবের ঈশ্বর সাধনার সারকথা লেখ।

২. সহপাঠীর টাকা চুরি করে ধরা পড়েছে তপন। সহপাঠীরা তাকে কঠিন শাস্তি দিতে চায়। তপন তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু তার সহপাঠীরা কোন কথাই কানে তুলছে না। তপনকে তারা শাস্তি দেবে। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন তাদের ধর্মশিক্ষক। তিনি সবকিছু শুনে তাদের ধর্ম বইয়ের শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কাহিনীটি শোনালেন। বন্ধুরা তপনকে ক্ষমা করে দিয়ে বুকে টেনে নিল।

- ক. শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কাহিনীটি কোন যুগের ঘটনা?
- খ. ধর্মশিক্ষক গল্প বলার উদ্দেশ্য কী ছিল?
- গ. ক্ষমার আদর্শ তোমাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- ঘ. শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কাহিনীটির সারকথা লেখ।

৩. জ্ঞানলাভের জন্য দেবতা, মানব ও দানব ব্রহ্মার আশ্রমে ব্রহ্মার্চ্য পালন করছিলেন। দীর্ঘকাল ব্রহ্মার্চ্য পালনের পর তাঁরা ব্রহ্মার উপদেশ নিয়ে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যাবেন। ব্রহ্মা সকলকে একই উপদেশ দিলেন। কিন্তু দেবতা, মানব ও দানব এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বুঝলেন যেমন—দমন কর, দান কর ও দয়া কর। একই উপদেশের ভিন্ন অর্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা বুঝেছিলেন সকলেই সঠিক।

- ক. ব্রহ্মা সকলের উদ্দেশ্যে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?
- খ. দেবতা, মানব ও দানব ব্রহ্মার উপদেশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করলেন কেন?
- গ. মানুষ হিসেবে ব্রহ্মার উপদেশকে তুমি ব্যক্তি জীবনে কীভাবে কাজে লাগাবে?
- ঘ. ভিন্ন অর্থ হওয়া সত্ত্বেও দেবতা, মানব ও দানব সকলেই ব্রহ্মার উপদেশের সঠিক অর্থ বুঝেছিলেন। কীভাবে সবাই সঠিক ছিলেন? বুঝিয়ে বল।

## আদর্শ জীবনচরিত

### স্বামী স্বরূপানন্দ

চাঁদপুরের গাঙ্গুলী পরিবার ছিল ধার্মিক পরিবার হিসেবে পরিচিত। এই পরিবারে আনুমানিক একশ বছর পূর্বে স্বামী স্বরূপানন্দ আবির্ভূত হন। পিতা সতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী, মাতা মমতাময়ী দেবী। সতীশ চন্দ্রের পিতা হরিহর গাঙ্গুলী ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। ভোলানন্দ গিরি মহারাজ তাঁকে বলতেন ‘কলিযুগের বশিষ্ঠ’। পিতার ধর্মানুরাগ পুত্রের মধ্যেও প্রকাশ পায়। এরূপ ধর্মপ্রাণ পিতার পুত্ররূপে জনগ্রহণ করেন স্বরূপানন্দ। তার পারিবারিক নাম বঙ্কিম চন্দ্র। আদর করে তাকে সবাই ডাকত বন্টু বলে।



স্বামী স্বরূপানন্দ

গ্রামের পাঠশালাতেই বন্টুর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। পাঠশালায় হঠাৎ একদিন সবকিছু কেমন যেন গুলট-পালট হয়ে গেল। গুরুমহাশয় হাতের লেখা লিখতে দিয়েছেন। অন্যদের মত ছোট বন্টুও লিখেছে। কিন্তু একি! সব মিলেমিশে এক হয়ে ‘ওঁ’ হয়ে যাচ্ছে। যতবার লিখতে যায়, ততবারই ‘ওঁ’ লেখা হয়ে যায়।

বাড়িতে গিয়ে বন্টু মাকে প্রশ্ন করে বিড়াল কিতাবে ডাকে। মা বলেন ‘মিয়াও মিয়াও’। ছোট বন্টু বলে, আমার মনে হয় বিড়াল ‘ওঁ’ ‘ওঁ’ ডাকে।

ছোট বয়সে স্বামী স্বরূপানন্দের হৃদয়ে যে ‘ওঁ’ ধ্বনির আবির্ভাব হয়, সেটাই পরবর্তীকালে হয় তাঁর সাধন মন্ত্র। ‘হরি ওঁ’ হয় তাঁর নামকীর্তন।

গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়। এরপর ঢাকায় এসে স্বরূপানন্দ এন্ট্রাস পাস করেন। কলেজে পড়তে যান কলকাতায়। তখন এই উপমহাদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসকদের অধীন। তাই শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার আন্দোলন। রিপন কলেজে বি.এ পড়ার সময় সেই স্বাধীনতা

আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তিনি বুঝলেন, দেশ স্বাধীন হবেই। তবে কি করে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে সেদিকে সজাগ হতে হবে। এ জন্য চরিত্রবান বলিষ্ঠ লোকের দরকার। তিনি বলতেন, “চরিত্রহীনের ঈশ্বর সাধনা ভুল, তার স্বদেশ সাধনা মিথ্যা।”

তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘মানুষের মাঝে দেবশক্তি রয়েছে; সে শক্তিকে জাগিয়ে তুললেই মানুষ দেব-মানবে পরিণত হবে’। আর এটি সম্ভব হবে তখন থেকে যখন মানুষ নির্মল চরিত্রের অধিকারী হবে। তাই তিনি শুরু করলেন চরিত্র গঠনের আন্দোলন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে গেছেন। দুঃখ-তাপে পীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন; শান্তিলাভের পথনির্দেশ দিয়েছেন। তবে এ কাজের জন্য ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করেননি। তাঁর ব্রতের নাম ‘অভীক্ষা ব্রত’। বারাণসী ধামে তাঁর আশ্রমের নাম ‘অযাচক আশ্রম’।

ধর্মে গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়েও স্বরূপানন্দ ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। তিনি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের কথা ভাবেননি। তিনি বলতেন, “আমি সকল সম্প্রদায়ের আর সকল সম্প্রদায়ই আমার”। তাঁর এই আদর্শরূপ লাভ করে ‘অখণ্ডমন্ডলী’ স্থাপনের মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা ধর্মের লোকেরা একই ঈশ্বরের আরাধনা করছেন। তাই তিনি ঈশ্বরকে একটি প্রতীক অর্থাৎ ‘ওঙ্কার’ বিগ্রহের মধ্যে আরাধনার কথা বলে গেছেন।

তিনি বলেন, “মানুষের ধর্ম যাই হোক নো কেন সে এক অখণ্ডসত্তা। আর এটি উপলব্ধির জন্য মানুষকে তার ভেতরের দৈবশক্তির জাগরণ ঘটাতে হবে। এভাবে মানুষ জীবনে পূর্ণতা লাভ করবে। সমগ্র মানুষ লাভ করবে অখণ্ড শান্তি”।

স্বরূপানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন জমিদার হরিহর মিশ্র। তাঁর ডাকে স্বরূপানন্দ গেলেন বিহার প্রদেশের ‘সিঙ্ভূমের’ ছোট গ্রাম ‘পুপুনকিতে’। হাজার বিঘা জংলা জমিতে তাঁদের কাজ শুরু হল। ধীরে ধীরে সেখানে গড়ে তুললেন ‘মালটি ভাসিটি’। এখানে ছাত্রদের ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত চারটি ভাষা শেখানো হতে লাগল। ভাষার সঙ্গে নানা ধরনের কর্ম শিক্ষারও ব্যবস্থা হল এখানে। ফলে এখানকার ছাত্ররা কৃষিকাজ, ছাপাখানা, ডেয়ারী প্রভৃতি বহুমুখী কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হল। এ যেন এক মানুষ গড়ার কারখানা তৈরি করে ফেললেন স্বরূপানন্দ।

স্বামী স্বরূপানন্দ একজন কর্মযোগী মহাপুরুষ। কর্মকে তিনি ধর্মের পর্যায়ে দেখেছেন। আবার ধর্মকে নিয়ে এসেছেন কর্মের মধ্যে।

মানুষকে দেব-মানবে উন্নীত করার পথ দেখিয়েছেন স্বামী স্বরূপানন্দ। তিনি মন্দির, মূর্তনা, মধুমল্লার, মঞ্জালমুরলী নামে সঙ্গীতের পুস্তক ছাড়াও ‘সরলব্রহ্মচর্য’, ‘আত্মগঠন’, ‘সংযম সাধনা’ ইত্যাদি প্রায় চল্লিশখানা পুস্তক রচনা করে গেছেন।

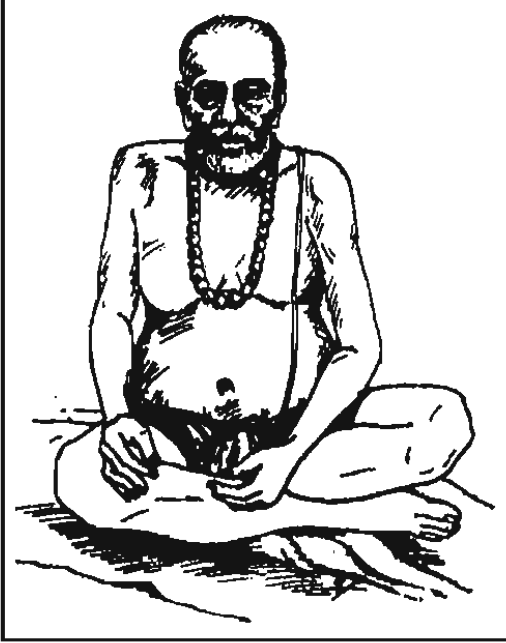
এই কর্মযোগী মহাপুরুষ ৯৭ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৩৯১ সালের ৮ই বৈশাখ শনিবার কলকাতার কাঁকুড়াগাছি আশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

### স্বামী স্বরূপানন্দের উপদেশ বাণী

১. পবিত্র হও, শুদ্ধ হও, প্রাণপণ যত্নে নির্মল হও। পবিত্রতাই পূর্ণতা, পবিত্রতাই দেবত্ব।
২. ধর্মের কাজ সর্বজীব সমদর্শিতা সৃষ্টি করা, জীব জীব ঐক্য সাধন করা। জীবের জীবত্ব ঘুচিয়ে তাকে শিবত্ব দান।
৩. যে যেভাবেই ভজন করুক সকলে এক ভগবানেরই অর্চনা করছে।
৪. আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হও। বিশ্বাস যার যত গভীর, সাফল্য তার তত অধিক।

## বামাক্ষেপা

বামাক্ষেপা একজন প্রসিদ্ধ বাঙালি সাধক। তিনি তান্ত্রিক পন্থাভিত্তে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সাধনার স্থল তারাপীঠ। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তারাপীঠ অবস্থিত। এই পীঠস্থানের রয়েছে তন্ত্রসাধনার একটি প্রাচীন ইতিহাস।



বামাক্ষেপা

বহুকাল আগের কথা। বশিষ্ঠদেব নামে একজন সাধক তারাদেবীর সাধনা করেন নীলাচলে। কিন্তু সেখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল না। তিনি গেলেন কামাখ্যায়। শূন্যচারে সাধনা করলেন তারামায়ের। না, এবারও তিনি ব্যর্থ হলেন। দৈববাণী হল, বশিষ্ঠ, তুমি আমার উপাসনার আচার জ্ঞান না। তাই সিদ্ধিলাভ করতে পারছ না। তুমি মহাচীনে গিয়ে আচার শিক্ষা করে এস। বশিষ্ঠ চীনদেশে গেলেন। সেখানে বৃন্দাবন জৈনদের নিকট তারা সাধনার আচার শিক্ষা করে এলেন। দৈব নির্দেশে বশিষ্ঠদেব হারকা নদীর পূর্বতীরে শ্মশান ভূমিতে গেলেন। সেখানে গাছের তলায় পঞ্চমুন্ডির আসন স্থাপন করলেন। প্রতিষ্ঠিত করলেন তারাদেবীর শীলাময়ী প্রতীক। শুরু করলেন কঠোর সাধনা। তারাদেবীর অনুগ্রহে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। তারাপুরের মহাশ্মশান পুণ্যভূমি হল। ব্রহ্মার মানসপুত্র এই বশিষ্ঠদেবের কীর্তি স্মরণ করে স্থানটিকে “বশিষ্ঠ সিদ্ধপীঠ” বলা হয়।

যুগ যুগ ধরে বহু তন্ত্রসাধক এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ক্ষেপা আনন্দনাথ, কৈলাসপতি, বামাক্ষেপা এঁরা সবাই তারাপীঠের সিদ্ধসাধক। তারাপীঠ হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান হয়ে রয়েছে।

তারাপীঠের নিকটে অটলা গ্রাম। ১২৪৪ বাংলা শিব চতুর্দশী তিথিতে বামাচরণ এখানে আবির্ভূত হন। পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মাতা হলেন রাজকুমারী দেবী। খেত খামারের সামান্য আয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। বামাচরণ এ সংসারের দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তান জয়কালী। এছাড়া দুর্গাদেবী, দ্রবময়ী ও সুন্দরী নামে তাদের তিন বোন এবং রামচন্দ্র নামে এক ভাই ছিল।

সর্বানন্দ বড় ধর্মভীরু ও সরল মানুষ। অল্প বয়সে দীক্ষা নিয়ে তিনি তারামায়ের আরাধনায় ডুবে যান। স্ত্রী রাজকুমারীও ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী। এমন মা বাবার সন্তান হয়ে বামাচরণও তারামায়ের ভক্ত হলেন। ‘জয়তারা জয়তারা বলে’ মাটিতে লুটোপুটি খায় বামা। বামাচরণ আপনভোলা, বড়ই সরল। তার সরলতা অন্যের চোখে ছিল পাগলামি।

গ্রামের পাঠশালাতেই বামাচরণের লেখাপড়ার শুরু। তবে পড়াশুনায় মন নেই। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে গুরুমহাশয়ের দিকে। কিছু লিখতে বললেই বামা চটপট লিখে দেয় ‘জয়তারা জয়তারা’। এরূপ লেখার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, তার বাবার নিকট শিখেছে যে তারা বিদ্যা মহাবিদ্যা। যাক এই বামা কোনো রকমে পাঠশালা শেষ করে। তার আর উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়া হয়নি। তবে বামার একটি বিশেষ গুণ ছিল। সে সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাইতে পারত। একবার তারামায়ের মন্দিরের সামনে গানের আসর বসেছে। বেহালা বাজাচ্ছেন পিতা সর্বানন্দ। ছেলে বামাকে কৃষ্ণ সাজিয়েছেন। পায়ে ঘুঙুর, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, কোমরে পীতবাস, গলায় বনফুলের মালা আর হাতে মুরলী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বামার সাজ দেখে আনন্দের রোল তুলছে। গায়ের মানুষ অবাক হয়ে বামার কৃষ্ণরূপ দেখে।

বামা একমনে গান গাইছে। হঠাৎ গান থামিয়ে সে জেদ ধরল, শ্মশান দেখতে যাবে। পিতার কোনো কথাতেই বামা শান্ত হল না। তখন বাধ্য হয়ে সর্বানন্দ পুত্র বামাকে নিয়ে এলেন শ্মশানপুরীতে। বশিষ্ঠ সিংহপীঠের সঙ্গে বামার পরিচয় হল। মহাশ্মশান দর্শনে বালক বামার ভাবান্তর হল। শ্মশানভূমিকে সে ভালোবেসে ফেলল।

এ ঘটনার পর বামাচরণ যেন কেমন হয়ে গেল। সত্যি সত্যি সে ক্ষেপায় পরিণত হল। শ্মশানভূমির সাথে, তারামায়ের সাথে বামার নিবিড় ভাব গড়ে উঠল। শুরু হল বামাচরণের শ্মশানলীলা। সে সময় শ্মশানে ছিলেন তন্ত্রসাধক ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। ব্রজবাসী কৈলাসপতি বাবাও ছিলেন সেখানে। কৈলাসপতি বামাকে দেন দীক্ষা, আর মোক্ষদানন্দ তাকে দেন সাধনার শিক্ষা। তারাপীঠের মহাশ্মশানে বামাচরণের তন্ত্রসাধনার জীবন শুরু।

সংসার থেকে তখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি বামাচরণ। একদিন হঠাৎ তার পিতার মৃত্যু হল, বামাচরণের বয়স তখন ১৮। সংসার কেমন করে চলবে, মা রাজকুমারী ভীষণভাবে চিন্তিত। তিনি বামাকে বললেন, একটা কিছু কর। তা না হলে যে বাড়ির সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। মায়ের কথায় বামাচরণ কাজ সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগল। মুলুক গ্রামের কালীমন্দিরে তার একটা কাজ জুটে গেল ভোগ রন্ধন ও পুষ্পচয়ন। মা আশ্বস্ত হলেন। এদিকে কিন্তু বামাচরণ ভেতরে ভেতরে মা তারার ধ্যান করতে থাকে। কাজে মনোযোগী হতে পারে না। ফুল তুলতে গিয়ে রক্তজবা দেখে তারামায়ের রাগাচরণের কথা মনে পড়ে তার। ভাবে বিভোর হয়ে গান ধরে, গাছতলায় বসে। পুরোহিতের ডাকাডাকিতেও সে সাড়া দেয় না। এ অবস্থায় তার চাকরি চলে যায়।

এরপর মায়ের নির্দেশে সংসারের কাজে লাগল। বামার কাজ হল মাঠে কৃষাণদের খাবার পৌঁছে দেয়া। কিন্তু এখানেও বামার পাগলামি প্রকাশ পায়। কৃষাণদের জন্য পাঠানো খাবার সে কোনোদিন পথের ভিখারিকে আবার কোনোদিন তারামন্দিরে এসে ওখানকার কুকুরগুলোকে খাওয়াত। ক্ষেপা ছেলেকে নিয়ে মা পড়লেন বিপদে। অগত্যা দুই ছেলেকেই তিনি মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বামাচরণ মামার বাড়িতে এসে গরু চরাত। কিন্তু এ কাজেও ব্যর্থ হল। গরু নিয়ে মাঠে গিয়ে রাখাল রাজার ভাবে বিভোর হয়ে যায়। আর গরুগুলো অন্যলোকের ফসল নষ্ট করে। এ নিয়ে গায়ের লোকজন বামার মামার নিকট অভিযোগ তোলে। তখন মামা তাকে গালাগালি ও প্রহার করেন। মামাবাড়িতেও বামার থাকা হল না। ছোট ভাইটিকে নিয়ে বামা মায়ের কাছে ফিরে আসে।

নিরুপায় হয়ে মা প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকারকে ধরলেন। তিনি নাটোরে সরকারি চাকরি করেন। তারামন্দিরের তার তার ওপর। তিনি বামাকে স্নেহ করতেন। তারামায়ের মন্দিরের ফুল তোলার কাজ দেয়া হল বামাকে। কিছু বেতন আর প্রসাদের ব্যবস্থা হয়ে গেল। বামাচরণ যেন এবার মনের মত কাজ পেল। কিন্তু এখানেও সে ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। ফুল তুলতে গিয়ে রক্তজবার ডালটি ধরে বেঁইশ হয়ে যায়। রক্তজবা দেখলেই তার মনে পড়ে তারামায়ের রাগাচরণ। এ অবস্থা দেখে দুর্গাদাস বামাকে মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। এখন তারামায়ের পূজার চন্দন, নৈবেদ্য ইত্যাদি তাকে যোগাড় করতে হবে। কিন্তু মাতৃধ্যানে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকায় বামা কোনো কাজই পারে না। বেঁইশ অবস্থায় পূজার উপকরণ সে নষ্ট করে ফেলে, ভাগ্যে জোটে তিরস্কার।

দুর্গাদাস মহাশয় বামার মধ্যে এক দিব্যভাব দেখতে পান। তাকে বাঁধাধরা কাজকর্ম করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। সবাইকে বলে দিলেন এখন থেকে ক্ষেপার কোনো নির্দিষ্ট কাজ থাকবে না। ইচ্ছামত কাজ করবে ও তারামায়ের কাছে থাকবে।

বামাক্ষেপার সাধনজীবন বিকশিত হতে চলেছে। প্রথমে দেখা দিল তার চরম বৈরাগ্য। শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই, মাথার উপর দিয়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা চলে যাচ্ছে। বামাক্ষেপা আনন্দময়ী মা তারাদেবীর ধ্যানে দিনরাত মগ্ন থাকে। সাধনায় তার সিংহলাভ হল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার যশের কথা। তারাপীঠের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন নাটোরের রাজপরিবার। এই কর্তৃপক্ষ বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের প্রধান করলেন। বামার কিন্তু খাদ্যাখাদ্য শূন্যশূন্য কোনোকিছুরই বিচার ছিল না। পূজাদি ও মন্ত্রতন্ত্র কিছুই মানত না। এই বেলপাতা লে মা, এই অনু লে মা, এই জল লে মা আর এই ফুল, ধূপ লে মা এই হল বামাক্ষেপার পূজা।

বামাচরণের এরূপ আচরণে মন্দিরের কর্মচারী, পুরোহিত ও তারাপীঠের কিছু লোকজন খুবই ক্ষিপ্ত। বামাক্ষেপাকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার কথা ভাবছেন তারা। সুযোগ এসে গেল। একদিন বামাক্ষেপা কোথা থেকে এসে হঠাৎ মায়ের ভোগ খেতে আরম্ভ করল। আর যাবেন কোথায়। পুরোহিতের ইজিাতে মন্দিরের দারোয়ানরা ক্ষেপাকে মারপিট করে। মার খেয়ে ক্ষেপা পালায় শ্মশানের জঙ্গলে। দুই তিনদিন হয়ে গেল ক্ষেপার আর দেখা নেই। এদিকে নাটোরের রানী অনুদাসুন্দরী স্বপ্নে দেখলেন তার মা বলছেন, আমার ছেলে ক্ষেপাকে তোর পুরোহিত, দারোয়ান দিয়ে মেরেছে, সে আঘাত লেগেছে আমার গায়ে। আমার পিঠ থেকে রক্ত পড়ছে। আজ দুই তিনদিন হয় আমার ছেলে না খেয়ে রয়েছে। আমিও ভোগ গ্রহণ করছি না।

স্বপ্ন ভেঙে গেল, রানীমা বিপদ আশঙ্কা করছেন। পরের দিন ভোরেই রাজকর্মচারী দিয়ে নির্দেশ পাঠালেন তারামায়ের মন্দিরে। বামাক্ষেপা সিংধপুরুষ মা তারার স্নেহের সন্তান; কোনো কাজে বা আচরণে কেউ কিছু বলতে পারবে না। আগে ক্ষেপাবাবার ভোজন হবে, তারপর তারামায়ের ভোগ।

রানী মাতার নির্দেশ প্রতিপালিত হল। শ্মশানের জঙ্গল থেকে ক্ষেপাকে খুঁজে এনে খাওয়ানো হল। তারপর বিপুল আয়োজনে তারামায়ের ভোগ দেয়া হল।

বামাক্ষেপা মা তারাকে যেমনি ভক্তি করতেন তেমনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন মায়ের প্রতিও। একদিন মা রাজকুমারী দেবীর মৃত্যু হয়। দাহ করার জন্য তাঁর শব তারাপীঠে আনা হয়। দ্বারকা নদীর অপর পারেই তারাপীঠের শ্মশান। ক্ষেপা তখন ঐ শ্মশানেই ছিলেন। বামাক্ষেপা দেখলেন ওপারে আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়। বর্ষাকালে নদীতে ভয়ানক ঢেউ থাকায় মায়ের মৃতদেহ এপারে আনার সাহস করছেন না। ওপারে দাহকার্যের ব্যবস্থা হচ্ছে। ক্ষেপা স্থির থাকতে পারলেন না। মায়ের আত্মার সদগতির জন্য তারাপীঠের শ্মশানে তাঁকে দাহ করা দরকার। ব্যাকুল কণ্ঠে ক্ষেপা বলে উঠলেন “মা তারা, আমার মা যেন তোর এ শ্মশানে ঠাই পায়”। বলেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন।

মায়ের মৃতদেহ চিতায় উঠানো হয়েছে। ছোট ভাই মুখাগ্নি করতে যাচ্ছে। এমন সময় বামাক্ষেপা পৌঁছে গেছেন সেখানে। মায়ের দেহটিকে তুলে কাপড় দিয়ে নিজের সঙ্গে বাঁধলেন। তারপর সাঁতার কেটে নদীর ওপারে চলে গেলেন। তারাপীঠের পবিত্র শ্মশানভূমিতে মাকে দাহ করা হল।

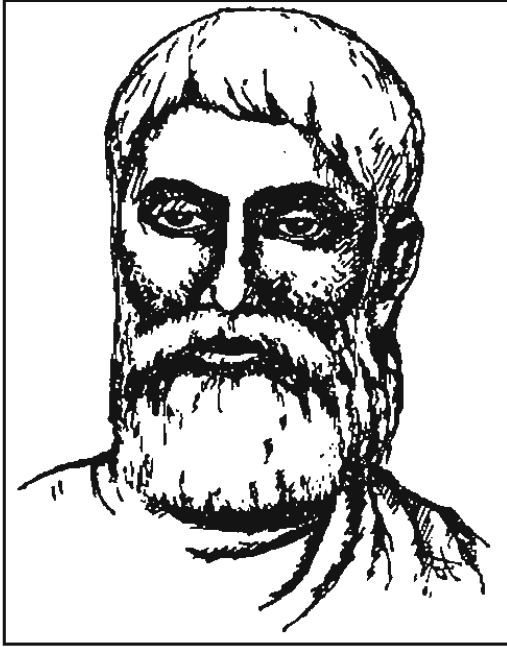
মাতৃশ্রাস্থের দিনেও এক বিঘ্ন উপস্থিত। মুষলধারে বৃষ্টি। কোনোরকমে শ্রাস্থক্রিয়া সম্পন্ন হল। কিন্তু নিমজ্জিত অতিথিদের কোথায় বসে খাওয়াবেন? ক্ষেপা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—“তারা মা, পাষণ বাপের মেয়ে বলে তুইও কি পাষণী হয়েছিস? আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করবি না?” দেখতে দেখতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। নিমজ্জিতদের ভোজন সম্পন্ন হল।

বামাক্ষেপা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দেশ ও দশের কল্যাণ করে গেছেন। তিনি লোকশিক্ষার জন্য বলতেন (১) ধর্ম অন্তরের জিনিস। বেশি আড়ম্বর করলে নষ্ট হয়। (২) মায়াকে জয় করতে পারলেই মহামায়ার কৃপা পাওয়া যায়। (৩) তারামার করুণা হলেও মোক্ষ পাওয়া যায়। (৪) গুরু, মন্ত্র আর ভগবান— এদের মধ্যে পার্থক্য ভাবতে নেই। তোমরা তা-ই ভাব, তোমাদের মজ্জা হবে। কলিযুগে মুক্তিসাধনা আর হরিনাম ছাড়া জীবের গতি নেই। (৫) দিনরাত যে কালীতারা, রাধাকৃষ্ণ নাম করে, পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে বামাক্ষেপা ১৩১৮ সালের ২রা শ্রাবণ নখর দেহ ছেড়ে অমর ধামে গমন করেন।

## সাধু নাগমহাশয়

নারায়ণগঞ্জ শহরের নিকটেই দেওভোগ গ্রাম। সেখানে নাগমহাশয়দের বাড়ি। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে আগস্ট ঐ নাগবাড়িতে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই শিশুই পরবর্তীকালে সাধু নাগমহাশয় নামে পরিচিত হয়। তবে এটি তার পিতা-মাতার দেওয়া নাম নয়। পিতা দীনদয়াল নাগ ও মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ছেলের নাম রাখেন দুর্গাচরণ নাগ। বড় হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করে দুর্গাচরণ হন নাগমহাশয়।



সাধু নাগমহাশয়

দুর্গাচরণের শৈশব অবস্থায় তার মা মারা যান। তখন পিসিমা মাতৃহারা ছেলে দুর্গাচরণ ও তার ছোট বোন সারদার লালন পালন করতে থাকেন। পিসিমা ভগবতী বাল্যবিধবা, দাদার সংসারে থাকেন। মা হারা ছেলেমেয়ে দুটি পিসিমার কোলেপিঠেই মানুষ হয়। লেখাপড়ায় দুর্গাচরণের খুব ঝোঁক। নারায়ণগঞ্জের পাঠশালাতে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। এরপর তিনি ঢাকার নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর গ্রাম থেকে স্কুলটির দূরত্ব ১০ মাইল। পায়ে হেঁটে এত দূর প্রতিদিন তাঁকে যাতায়াত করতে হত। স্কুল থেকে ফিরতে রাত হয়ে যেত। ফেরার পথে খেতেন শুধু এক পয়সার মুড়িমুড়কি। ওখানকার পড়া শেষে বাবা তাকে কলকাতায় নিয়ে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এলোপ্যাথি দুর্গাচরণের ভালো লাগল না। তিনি হোমিওপ্যাথি পড়তে শুরু করলেন।

এই সময়ে দুর্গাচরণ ও তার বোন সারদার একই দিনে বিয়ে হয়। বিয়ের ব্যাপারে স্নেহময়ী পিসিমার খুব উৎসাহ ছিল। বিক্রমপুরের রাইজদিয়া গ্রামের জগন্নাথ দাসের কন্যা

প্রসন্নকুমারী হলেন দুর্গাচরণের সহধর্মিণী। বিয়ের পাঁচ মাস পরে দুর্গাচরণ কলকাতায় যান।

ডাক্তার হয়ে দুর্গাচরণ কলকাতায় চিকিৎসার কাজ শুরু করেন। গরিব-দুঃখীদের চিকিৎসা ও তাদের মধ্যে ঔষধ বিতরণই তার কাজ। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেন। ইচ্ছে করলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। পরোপকারই ছিল তার ব্রত।

একদিন এক গরিবের বাড়ি চিকিৎসা করতে যান। রোগীর অবস্থা শোচনীয়। তিনচার ঘণ্টা বসে থেকে তার শুষুবা করলেন। ঔষধ খাওয়ালেন। রাতে আবার তাঁকে দেখতে গেলেন। শীতকাল। ভাঙা ঘর। রোগীর শীত নিবারণেরও বস্তু নেই। দুর্গাচরণ ভাবলেন একেতো কঠিন রোগ, তাতে ঠান্ডায় রোগীকে বাঁচানো কষ্ট। তিনি নিজের গায়ের ভাগলপুরী চাদরটি রোগীর গায়ে দিয়ে চলে গেলেন। দুর্গাচরণের এরূপ পরোপকারের আরও অনেক ঘটনা রয়েছে।

অল্প বয়সেই দুর্গাচরণের প্রথম স্ত্রী মারা যান। স্ত্রী মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত হন। পরে সংসারবন্দন থেকে ভগবান তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন ভেবে নিশ্চিত হন। এদিকে পিতা দীনদয়াল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন পুত্র, পুত্রবধূর মাধ্যমে তাঁর সংসার প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। দীনদয়াল স্থির করলেন পুত্রের আবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু দুর্গাচরণ পুনরায় বিয়ে করতে রাজী নন। শেষে পিতার প্রবল আগ্রহে দুর্গাচরণ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজী হলেন।

বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। পিতাপুত্র কলকাতা থেকে দেশে ফিরলেন। নিজ গ্রামনিবাসী রামদয়াল ভৌমিকের কন্যা শরৎকামিনীর সঙ্গে দুর্গাচরণের বিয়ে হল। বিয়ের পর দুর্গাচরণ পিতার সঙ্গে কলকাতা গেলেন।

রোগীর চিকিৎসা, বন্ধু-বান্ধবের সহিত মেলামেশা, ভগবৎপ্রসঙ্গ এই নিয়ে দুর্গাচরণের দিন কাটে। হঠাৎ পত্র পেলেন পিসিমা অসুস্থ। দুর্গাচরণ দেশে ফিরলেন। পিসিমা বৃন্দা। অসুখে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। অনেক চেষ্টা করেও তাকে সুস্থ করা যাচ্ছে না। মৃত্যুর ১৫ মিনিট আগেও পিসিমা জপ করেছিলেন। দুর্গাচরণের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, “তোমার যেন রামে মতি থাকে।”

পিসিমার মৃত্যুতে দুর্গাচরণ গভীরভাবে শোকগ্রস্ত। ছোট সময় মাকে হারিয়ে পিসিমার স্নেহেই বড় হয়েছেন। তিনি বলতেন, “পিসিমা-ই আমার জন্মজন্মান্তরের মা ছিলেন”।

কলকাতায় ফিরে এলেন দুর্গাচরণ। সারাঙ্কণ চিন্তা করে, কিসে মহামায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন? কি উপায়ে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা যায়? কোন সাধনায়, কোন মহাপুরুষের কৃপায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়? এমন চিন্তায় দুর্গাচরণের মন অস্থির।

১৮৮০ সাল। স্বামী ও শ্বশুরের সেবার জন্য দুর্গাচরণের স্ত্রী শরৎকামিনী কলকাতায় যান। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর স্বামী সাধারণ মানুষ নন। সংসারে থাকলেও সংসার বিরাগী সাধক পুরুষ।

স্বামীর উপদেশে শরৎকামিনীর মধ্যেও ধর্মভাব জেগে উঠল। সংসারের কাজকর্ম করার সাথে সাথে তিনিও ধর্মচর্চায় দিন কাটান। দুর্গাচরণ দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। গজাভীর্ষে বসে ভাবছেন। এমন সময় দেখলেন একটি নৌকা এসে তীরে লাগল। দুর্গাচরণ কৌতূহলী হয়ে নিকটে গিয়ে দেখলেন নৌকায় তাঁরই কুলগুরু বিক্রমপুরের বজ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। দুর্গাচরণকে তিনি বলেন, “বাবা, মহামায়ার আদেশে তোমাকে মন্ত্র দীক্ষিত করতে এখানে এসেছি।” দুর্গাচরণের আনন্দ আর ধরে না। কুলগুরুর নিকট স্ত্রীসহ দুর্গাচরণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শুরু হল তাঁর কঠোর সাধনা।

হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের শ্রীসুরেশ চন্দ্র দত্ত দুর্গাচরণের অনেকদিনের পরিচিত ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সাধনভজন ধ্যান ধারণা নিয়ে আলোচনা হয়। কথাপ্রসঙ্গে সুরেশ চন্দ্রের নিকট থেকে জানলেন দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন। তিনি ত্যাগী, মহাপুরুষ, ভগবৎ প্রসঙ্গে তন্ময় হয়ে থাকেন।

তাঁরা দুজনে এলেন দক্ষিণেশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। ঠাকুর তাঁদের পরিচয় জানলেন। তারপর বললেন, “সংসারে থাকবে ঠিক পাকাল মাছের মত। গৃহে থাকো, তার আর দোষ কি? পাকাল মাছ পাকে থাকে কিন্তু গায়ে পাক লাগে না। তেমনি গৃহে থাকবে কিন্তু সংসারের ময়লা মনে লাগবে না।”

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁরা চলে এলেন। পথে আসতে আসতে দুর্গাচরণের কেবলই মনে হতে লাগল সত্যিই ইনি সিদ্ধ মহাপুরুষ।

সপ্তাহখানেক পর দুর্গাচরণ ও সুরেশ আবার ঠাকুরকে দেখতে গেলেন। দুর্গাচরণকে দেখামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হল। তিনি বলে উঠলেন, “এসেছিস তো বেশ করেছিস, আমি যে তোদের জন্য হেঁথায় বসে রয়েছি।”

তৃতীয় দিন দুর্গাচরণ একাই দক্ষিণেশ্বর গেলেন। সেদিনও তাঁকে দেখামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হল। তিনি দুর্গাচরণকে বললেন, “ওগো, তুমি না ডাক্তারি কর, দেখ দিকি আমার পায়ে কি হয়েছে।” দুর্গাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ সেবার সুযোগ পেলেন। নিজেকে ধন্য মনে করলেন। বার বার শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ হৃদয়ে মস্তকে ধারণ করতে লাগলেন।



শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে যথার্থ গৃহস্থেরা ধর্ম শিখবে।”

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা পেয়ে দুর্গাচরণ হলেন নাগমহাশয়। পরে এ নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর নাগমহাশয় কলকাতা থেকে দেশের বাড়ি দেওভোগে চলে আসেন। তাঁর সাধনা চলতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সাধনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে মানুষ তাঁকে দর্শন করতে আসে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধুসন্তের দলও তাঁকে দর্শন করতে আসতেন। ভক্তরা নাগমহাশয় বলতেন না, বলতেন ‘সাধুমহাশয়’। নাগমহাশয়ের মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দ দেওভোগে গিয়েছিলেন। একদিন তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং সাধু নাগমহাশয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। নাগমহাশয়ের স্ত্রী বিবেকানন্দকে একখানি কাপড় দেন। বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাভরে সেটি মস্তকে ধারণ করেন।

নাগমহাশয়ের পিতা বৃন্দ হয়েছেন। একবার অর্ধোদয় যোগের সময় তিনি নাগমহাশয়কে বললেন, তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, নাগমহাশয়ের মাথায় যেন বাজ পড়ল। পিতাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার মত এত টাকা তাঁর নেই। মুখে বললেন, “আচ্ছা দেখা যাবে।”

গজ্ঞানানের মাত্র দু’দিন বাকি। বাবা হতাশ হয়ে পড়লেন। স্নানের দিন দুর্গাচরণ বাবাকে স্নান করতে ডাকলেন। দুর্গাচরণ বাড়ির উঠানে গর্ত খুঁড়লেন। হঠাৎ সেখান থেকে প্রবল বেগে জল উঠতে শুরু করল। দেখতে দেখতে উঠান ভেসে গেল। আনন্দে নাগমহাশয় বললেন, “মা গজ্ঞা এসেছেন, মা গজ্ঞা এসেছেন। এখানে এসে সবাই স্নান কর।” খবর পেয়ে গ্রামের লোক জড়ো হল। সবাই মনের আনন্দে অর্ধোদয় যোগের পুণ্যলগ্নে গজ্ঞাস্নান করল। নাগমহাশয়ের পিতাও গজ্ঞাস্নান করে তৃপ্ত হলেন।

পিতার মৃত্যুর পর নাগমহাশয়ের সংসারের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠে। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে সাধু নাগমহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দিন দিন ব্যাধি বাড়তে লাগল। এ অবস্থাতেই তিনি কালীপূজা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ৯ই পৌষ শনিবার রাতে পূজা করা হল। প্রতিমা বিসর্জনের পর সাধু নাগমহাশয় বললেন, “মা চলে গেলেন, আমার এবার যাবার পালা।” ১৩ই পৌষ ৮টায় তাঁর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়। ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, “ওরে, আমাকে রাম-নাম শুনতে দে।” তারপর রাম-নাম শুনতে শুনতে সাধক সাধু নাগমহাশয় আশ্রয় নিলেন তাঁর সাধনধামে।

## সাধু নাগমহাশয়ের উপলব্ধি

১. ঈশ্বর যে আছেন তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। আছে, বস্তু নিয়ে আবার বিচার কেন? ভগবান যে সূর্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ।
২. ভগবানই একমাত্র সত্য। তাঁরে লাভ করতে পারলে জীবন ধন্য।
৩. যত থাকে গুপ্ত, তত হয় পোক্ত। আর যত হয় ব্যক্ত, তত হয় ত্যক্ত।

## সারদা দেবী

সারদা দেবী একজন সাধিকা। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা শ্যামাসুন্দরী। তাঁরা উভয়েই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, অমায়িক ও ঈশ্বরভক্ত। সামান্য জমিজমার ফসল ও যজন-যাজনের উপার্জনে কোন রকমে তাঁদের দিন কাটে।



শ্রী সারদা দেবী

এই দরিদ্র পরিবারে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সারদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকন্যার নাম রাখা হয় শ্রীমতি ঠাকুরমণি দেবী। মা তাঁর নাম দেন ক্ষেমৎকরী। শিশুকন্যার স্নেহময়ী মাসী নাম রাখলেন সারদা।

সারদা মা বাবার প্রথম সন্তান। তবে তাঁর একটি বোন ও পাঁচটি ভাইও ছিল। সেকালে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সংসারের কাজকর্ম করবে না। তাই সারদার বাবা মেয়ের লেখাপড়ার দিকে ছিলেন উদাসীন। তবে সারদা নিজের আগ্রহে ভাইদের সাথে গ্রামের পাঠশালায় যেত। এভাবে সে কিছু কিছু পড়া শিখলেও লিখতে শিখল না। বইপড়া বিদ্যা না থাকলেও কথক ঠাকুরের কথা, যাত্রা, কীর্তন শুনে সারদা অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শিখে নিয়েছিল।

বাল্যকাল শেষ না হতেই সারদা দেবীর বিয়ে হয়। বিয়ের পাত্র হলেন কামার পুকুর গ্রামের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে গদাধর। এই গদাধরই হলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিয়ের পর বছর দেড়েক কামারপুকুরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। অপরদিকে সারদা দেবী রয়ে গেলেন পিত্রালায়ে। বছর দুই পরে গদাধর দ্বিতীয়বার শ্বশুর বাড়ি যান। তখন সারদা দেবী তাঁর সেবায়ত্ত্ব করে।

সাত বছর পরের ঘটনা। গদাধর এসেছেন জন্মভূমি দর্শন করার জন্য। সঙ্গে এসেছেন তাঁর তত্ত্ব সাধনার গুরুভৈরবী এবং ভাগিনেয় হৃদয়। জয়রামবাটি থেকে সারদা দেবীকেও আনা হয়। এ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে জীবনের কর্তব্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক উপদেশ দেন। সারদা দেবীকে বলেন, “ঈশ্বর সকলেরই অতি আপনার। যে তাঁকে মনে প্রাণে ভালোবাসে, ডাকে, সেই তাঁর দেখা পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। আর তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।”

স্বামীর উপদেশ সারদা দেবীর অন্তর স্পর্শ করল। পতির উপদেশকে জীবনের ধ্রুবতারা করে তাঁর বাক্য মন্ত্ররূপে গ্রহণ করলেন। সাধনার পথে যাত্রা শুরু হল।

সাত মাস গ্রামে কাটাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে চলে যান। আর সারদা দেবী চলে আসেন জয়রামবাটিতে। অনেক দিন চলে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে কোনো ডাক এল না। সারদা দেবী স্বামীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি জানতে পারলেন ১৮৭২ সালে কলকাতায় গজাণ্ডাতীরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গজাস্নান উৎসব হবে। গ্রামের লোকজনের সাথে সারদা দেবীও গজাস্নানে যেতে চান। পিতা রামচন্দ্র মেয়েকে সঙ্গে করে পায়ে হেঁটে কলকাতার পথে রওনা হলেন।





১০. সংসারে থেকেও কী করা যায়?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ক. ধর্ম কর্ম    | খ. দুঃখীর সেবা |
| গ. স্বামীর সেবা | ঘ. পরোপকার     |

১১. নাগমহাশয়ের স্ত্রী বিবেকানন্দকে কী দেন?

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| ক. কিছু টাকা   | খ. একখানি কাপড় |
| গ. একখানি চাদর | ঘ. কিছু গহনা    |

১২. মা সারদার ক্ষেমৎকরী নামটি কে দেন?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ক. তাঁর বাবা | খ. তাঁর মা   |
| গ. তাঁর মাসী | ঘ. তাঁর মামা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বামীর মৃত্যুর পর শাস্ত্র অনুযায়ী সারদা দেবী তাঁর বেশভূষা পরিবর্তন করতে গেলে হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন “আমি কি কোথাও গিয়েছি? এ যেমন এঘর আর ওঘর।” মা সারদা আর বেশভূষা পরিবর্তন করলেন না।

১৩. আমি কি কোথাও গিয়েছি—এ আমি কে?

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ক. ঈশ্বর স্বয়ং | খ. মা কালী স্বয়ং    |
| গ. শ্রীরামকৃষ্ণ | ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ |

১৪. মা সারদা কোন বেশ ধারণ করতে চেয়েছিলেন?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. মা কালীর | খ. সধবার   |
| গ. বিধবার   | ঘ. সাধিকার |

১৫. শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে কোন বিষয়ে উপদেশ দেন?

- i. জীবন ও জগৎ
- ii. কর্তব্য ও ঈশ্বর
- iii. ঈশ্বর ও যজ্ঞ-যাজন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. বাল্যকাল থেকেই ধর্মপ্রাণ ও সৎচরিত্রের অধিকারী স্বরূপানন্দ বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে দেবশক্তি আছে। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি মানুষের চরিত্র গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি কর্মকে ধর্ম মনে করতেন। তিনি সিংভূমের পুপুনকিতে গড়ে তুললেন একটি ভার্টিসিটি যেখানকার ছাত্ররা সৎ চরিত্র গঠনের মাধ্যমে কর্মযোগী হয়ে ধর্ম-কর্ম করা শুরু করে দেয়।

- ক. পুপুনকিতে স্থাপিত ভার্টিসিটির নাম কী?
- খ. তিনি এই ভার্টিসিটি স্থাপন করেন কেন?
- গ. স্বরূপানন্দের শিক্ষা তোমাকে কীভাবে কর্মযোগী করবে?
- ঘ. “কর্মই ধর্ম”—কথাটি স্বরূপানন্দের সাধনজীবনের আলোকে বুঝিয়ে লেখ।

২. “তারাবিদ্যা মহাবিদ্যা” বাল্যকালের এই শিক্ষা বামাক্ষেপার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং আস্তে আস্তে তিনি তাঁর মার কঠোর তপস্যা সাধন করে সিদ্ধি লাভ করেন। এই সাধনার পথে অনেক বাধা বিপত্তি, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। অনেকে তাঁর সাধনাকে পাগলামি বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো পিছপা হননি।

- ক. “তারাবিদ্যা মহাবিদ্যা”—এই শিক্ষা বামাক্ষেপাকে কে দিয়েছিলেন?
- খ. কোনো বাধা বিপত্তি বামাক্ষেপাকে আটকাতে পারেনি কেন?
- গ. নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বামাক্ষেপার সাধনজীবন তোমাকে কীভাবে পথ দেখাবে?
- ঘ. অনেকে বামাক্ষেপার সাধনাকে পাগলামি বলে অভিহিত করেছে এ কী সমর্থন যোগ্য? তোমার মতামত দাও।

৩. দুর্গাচরণ গরিব দুঃখী মানুষের সেবা করতেন। একদিন এক গরিব রোগীকে নিজ হাতে সেবা শুলুসা করে, শীতের রাতে নিজের গায়ের চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। এইভাবে রোগীর চিকিৎসা, বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলামেশা, ভগবৎ আলোচনা করে তাঁর সময় কাটে। একদিন দক্ষিণেশ্বরের এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি মা কালীর সাধক হলেন। সংসার জীবনে অবস্থান করেই তিনি মা কালীর সাধনা করেন।

- ক. দুর্গাচরণ দক্ষিণেশ্বরে কোন সাধুর কাছে দীক্ষা নেন?
- খ. নিজে শীত ভোগ করে তিনি তাঁর চাদরে রোগীকে ঢেকে দিলেন কেন?
- গ. দুর্গাচরণের রোগী সেবার কাহিনীটি তোমাকে কী শিক্ষা দেয়?
- ঘ. দুর্গাচরণের সাধন পদ্ধতির সারকথা লেখ।

### সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. বাল্যকাল থেকেই ধর্মপ্রাণ ও সৎচরিত্রের অধিকারী স্বরূপানন্দ বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে দেবশক্তি আছে। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি মানুষের চরিত্র গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি কর্মকে ধর্ম মনে করতেন। তিনি সিংভূমের পুপুনকিতে গড়ে তুললেন একটি ভাসিটি যেখানকার ছাত্ররা সৎ চরিত্র গঠনের মাধ্যমে কর্মযোগী হয়ে ধর্ম-কর্ম করা শুরু করে দেয়।
  - ক. পুপুনকিতে স্থাপিত ভাসিটির নাম কী?
  - খ. তিনি এই ভাসিটি স্থাপন করেন কেন?
  - গ. স্বরূপানন্দের শিক্ষা তোমাকে কীভাবে কর্মযোগী করবে?
  - ঘ. “কর্মই ধর্ম”—কথাটি স্বরূপানন্দের সাধনজীবনের আলোকে বুঝিয়ে লেখ।
২. “তারাবিদ্যা মহাবিদ্যা” বাল্যকালের এই শিক্ষা বামাক্ষেপার মনে গভীর রেখাপাত করে এবং আস্তে আস্তে তিনি তাঁর মার কঠোর তপস্যা সাধন করে সিদ্ধি লাভ করেন। এই সাধনার পথে অনেক বাধা বিপত্তি, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। অনেকে তাঁর সাধনাকে পাগলামি বলেও অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো পিছপা হননি।
  - ক. “তারাবিদ্যা মহাবিদ্যা”—এই শিক্ষা বামাক্ষেপাকে কে দিয়েছিলেন?
  - খ. কোনো বাধা বিপত্তি বামাক্ষেপাকে আটকাতে পারেনি কেন?
  - গ. নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে বামাক্ষেপার সাধনজীবন তোমাকে কীভাবে পথ দেখাবে?
  - ঘ. অনেকে বামাক্ষেপার সাধনাকে পাগলামি বলে অভিহিত করেছে এ কী সমর্থন যোগ্য? তোমার মতামত দাও।
৩. দুর্গাচরণ গরিব দুঃখী মানুষের সেবা করতেন। একদিন এক গরিব রোগীকে নিজ হাতে সেবা শুশ্রূষা করে, শীতের রাতে নিজের গায়ের চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। এইভাবে রোগীর চিকিৎসা, বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলামেশা, ভগবৎ আলোচনা করে তাঁর সময় কাটে। একদিন দক্ষিণেশ্বরের এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি মা কালীর সাধক হলেন। সংসার জীবনে অবস্থান করেই তিনি মা কালীর সাধনা করেন।
  - ক. দুর্গাচরণ দক্ষিণেশ্বরে কোন সাধুর কাছে দীক্ষা নেন?
  - খ. নিজে শীত ভোগ করে তিনি তাঁর চাদরে রোগীকে ঢেকে দিলেন কেন?
  - গ. দুর্গাচরণের রোগী সেবার কাহিনীটি তোমাকে কী শিক্ষা দেয়?
  - ঘ. দুর্গাচরণের সাধন পদ্ধতির সারকথা লেখ।

১০. সংসারে থেকেও কী করা যায়?

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| ক. ধর্ম কর্ম    | খ. দুঃখীর সেবা |
| গ. স্বামীর সেবা | ঘ. পরোপকার     |

১১. নাগমহাশয়ের স্ত্রী বিবেকানন্দকে কী দেন?

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| ক. কিছু টাকা   | খ. একখানি কাপড় |
| গ. একখানি চাদর | ঘ. কিছু গহনা    |

১২. মা সারদার ক্ষেমৎকরী নামটি কে দেন?

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ক. তাঁর বাবা | খ. তাঁর মা   |
| গ. তাঁর মাসী | ঘ. তাঁর মামা |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

স্বামীর মৃত্যুর পর শাস্ত্র অনুযায়ী সারদা দেবী তাঁর বেশভূষা পরিবর্তন করতে গেলে হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন “আমি কি কোথাও গিয়েছি? এ যেমন এঘর আর ওঘর।” মা সারদা আর বেশভূষা পরিবর্তন করলেন না।

১৩. আমি কি কোথাও গিয়েছি—এ আমি কে?

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ক. ঈশ্বর স্বয়ং | খ. মা কালী স্বয়ং    |
| গ. শ্রীরামকৃষ্ণ | ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ |

১৪. মা সারদা কোন বেশ ধারণ করতে চেয়েছিলেন?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. মা কালীর | খ. সধবার   |
| গ. বিধবার   | ঘ. সাধিকার |

১৫. শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে কোন বিষয়ে উপদেশ দেন?

- i. জীবন ও জগৎ
- ii. কর্তব্য ও ঈশ্বর
- iii. ঈশ্বর ও যজ্ঞ-যাজ্ঞন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |